১০ম বার্ষিক
ফুযালা সম্মেলন
উপলক্ষে প্রকাশিত
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
ইতিহাস ও
উপদেশ
رابطة ابناء الرحمانية
RABETA-E ABNA-E RAHMANIA
রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
ইতিহাস ও উপদেশ

প্রথম সংস্করণ (সংক্ষিপ্ত)
প্রকাশকাল :
রবিউল আখির ১৪৪৩ হিজরী
নভেম্বর ২০২১ ঈসায়ী
অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সূ|চী|প|ত্র

প্রকাশক
রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া
rabetaar@gmail.com

কেন্দ্রীয় কার্যালয়
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭

নির্ধারিত মূল্য : ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

আমাদের কথা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক সাতমসজিদ কোলে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আকাবির ও আসলাফের চিন্তাধারার লালনক্ষেত্র দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া। প্রতিষ্ঠালগ্নের সীমাহীন কষ্ট ও ত্যাগের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা প্রতিষ্ঠার মাত্র দু'-তিন বছরের মধ্যেই দান করেছিলেন ঈর্ষণীয় সাফল্য। প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তাগণের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রণীত কঠোর নিয়মনীতি এবং সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নে সকলের একাত্মতায় এখানে তৈরী হয়েছিল এক নিষ্ঠা ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ। ফলে প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালকের কেউই ঘৃণাক্ষরেও কল্পনা করতো না যে, শীঘ্রই এখানে কোন অনৈক্য, বিরোধ ও বিভাজন সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু 'তকদীর-লিখন না যায় খণ্ডন'-এর নির্মমতা তৃতীয় মুহতামিমের দায়িত্বকাল থেকে উঁকি-ঝুঁকি দিতে আরম্ভ করে। এখানেও রোপিত হয় বিভাজনের সেই তিক্ত রাজনীতি ও পরিবারপ্রীতির বীজ। অল্পদিনেই যা অঙ্কুর থেকে কাণ্ড ও কাণ্ড থেকে শাখা-পল্লবে রূপান্তরিত হয়।

একসময়ে এখানে যারা ছিলেন দেহের হাত-পায়ের মতো অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মাত্র এক যুগের ব্যবধানে তাদের মাঝে তৈরি হয় পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব, স্থাপিত হয় অনাস্থা অভিযোগ দখল ও অভ্যুত্থানের মতো নোংরা সব দৃষ্টান্ত। ফলে মুরুব্বীগণের প্রতিটি ইশারায় নতশির পরিচালনা পরিষদের সাধারণ দীনী হিতাকাঙ্ক্ষীরা মুরুব্বীদের কাজে হস্তক্ষেপের সুযোগ পেলেন; বরং একপর্যায়ে দীনী স্বার্থে বাধ্যও হলেন। এতে বিরোধ সৃষ্টি হল এবং বিরোধ বিচ্ছেদে রূপান্তরিত হল। একদেহ দ্বি-খণ্ডিত হল।

ধারণা করা যায় যে, দু'-পক্ষের কাছেই দীনী স্বার্থ মুখ্য ছিল। তবে এটাও নিশ্চিত যে, এক পক্ষের অবস্থান অবশ্যই ভুল ছিল।

পাঠককে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে, এখানে দু'-পক্ষ বলতে একদিকে ছিলেন জামিআর প্রতিষ্ঠাতা-শাইখ, তৃতীয় রঈস, সকলের প্রাণপ্রিয় মুরুব্বী শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহিমাহুল্লাহ। অপরদিকে প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, সেক্রেটারী, জমিদাতা ওয়াকিফ ভ্রাতৃদ্বয়সহ পূর্ণ পরিচালনা পরিষদ। দু'-চারজন ছাড়া সকল শিক্ষক শাইখ রহিমাহুল্লাহর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই জামিআর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বাস্তবতার বিচারে পরিচালনা পরিষদের অবস্থানকে সঠিক মনে করতেন। এ কারণেই ০২/০৭/২০০০ তারিখে কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে শাইখ রহিমাহুল্লাহ যখন জামিআ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হন তখন ইতোপূর্বে বিভিন্ন কারণে অব্যাহতিপ্রাপ্তগণের বাইরে একজন শিক্ষক ছাড়া আর কোন শিক্ষক জামিআ ছেড়ে শাইখ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে গিয়ে যুক্ত হননি; অথচ এক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল এবং কোন রকম বাধা ছিল না।

অনুরূপভাবে ০৩/১১/২০০০ তারিখে যখন বেআইনীভাবে ও সম্পূর্ণ সন্ত্রাসী কায়দায় জামিআর ভবন জবরদখল করে শাইখ রহিমাহুল্লাহর হাতে তুলে দেয়া হল, তখনও বিভিন্ন রকম প্রলোভন দেখানো সত্ত্বেও পাঁচ/ছয়জন শিক্ষক ও কতিপয় স্টাফ ছাড়া বাকি সকল শিক্ষক ও স্টাফ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুরম্য ভবন ছেড়ে শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করে পরিচালনা পরিষদকে সঙ্গ দিয়ে নিশ্চিত কষ্ট ও ত্যাগের পথকে বেছে নিয়েছে এবং আলহাজ্ব নূর হোসেন সাহেবের গোডাউনে অস্থায়ী ঠিকানায় পূর্ণ স্বাধীনভাবে জামিআ রাহমানিয়ার নীতি ও আদর্শ লালন করা শুরু করেছে। আর পরিচালনা পরিষদ কালবিলম্ব না করে রাহমানিয়ার মুরুব্বীগণের আধ্যাত্মিক রাহবার মুজাদ্দিদে দীন হযরত হারদূয়ী রহিমাহুল্লাহর পরামর্শমতে দখলের প্রতিকার চেয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে এবং দখলদারগণ কর্তৃক দায়ের করা মিথ্যা মামলাসমূহের আইনী মোকাবেলায় মনোনিবেশ করেছে। সঠিক তথ্য-উপাত্ত ও অনস্বীকার্য প্রমাণাদির কারণে আদালতের কার্যক্রমে আল্লাহর রহমতে তাদের কখনও ব্যর্থ হতে হয়নি। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তদবীর করেই উল্লেখযোগ্য সব ক'টি মামলায় কমিটির পক্ষেই রায় এসেছে। যদিও প্রতিপক্ষের কূটকৌশলের কারণে সে রায়গুলোর বাস্তবায়ন বারবার ব্যাহত হয়েছে কিন্তু কর্তৃপক্ষ একদিনের জন্যও আইনী প্রক্রিয়া থেকে পিছপা হয়নি। অবশেষে সে আইনী কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায়ই দীর্ঘ ২০ বছরের বেআইনী দখলের অবসান ঘটেছে।

এক্ষেত্রে বর্তমান সরকার তার সাধারণ দায়িত্ব পালনার্থে সহায়তা করেছে বটে কিন্তু এ সহায়তা পাওয়ার জন্য জামিআ কর্তৃপক্ষের কারও সরকারী দলে যোগদান করা, প্রকাশ্যে সরকারবিরোধিতা আর গোপনে ঘনিষ্ঠতা এসবের কোনটিই করতে হয়নি।

কি অবাক কাণ্ড! গঠনতন্ত্র ও নীতিমালার খেলাফ করে, পরিচালনা পরিষদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে জামিআর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিনষ্টের দায়ে একপক্ষ যখন কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে জামিআ থেকে অব্যাহতি পেল তখন পরিচালনা পরিষদের যৌক্তিক পদক্ষেপের শুধু সমর্থক হওয়ার কারণে সমালোচনা, গালাগাল, অপবাদ ও অভিযোগসহ হুমকি-ধমকির নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছেন মুফতী মনসূরুল হক, মাওলানা হিফজুর রহমান ও তাঁদের সহকর্মীগণ। মাত্র দেড় বছরের মাথায় সেই পক্ষই যখন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাব, পেশীশক্তি, অস্ত্র-শস্ত্র, সন্ত্রাস ও বোমাবাজির মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষকদের লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করে ভবনটি জবরদখল করে নিল তখন কিন্তু সেই সমালোচকগোষ্ঠীর অনেকেই বেজায় উৎফুল্ল হল আর বাকিরা এমনভাবে মুখে কুলুপ এঁটে নিল যে, সমালোচনার মতো কিছুই যেন ঘটেনি।

ধরে নিলাম, শাইখ রহিমাহুল্লাহর প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধার কারণেই হয়তো তারা যাচাই-বাছাই ছাড়াই এমন উল্টোনীতিকে বৈধ মনে করেছেন। কিন্তু শাইখ রহিমাহুল্লাহর ওফাতের পর বেআইনীভাবে দখলকৃত ভবনটি যখন শাইখ রহিমাহুল্লাহর পুত্র-দৌহিত্রদের হাতে মৌরুসী সম্পত্তির মতো হয়ে গেল, তখনও কেন দেশের আলেমসমাজ মুফতী মনসূরুল হক ও মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবদ্বয়ের দীর্ঘ সময়ের ছাত্রদেরকে বৈধ কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রদত্ত আদালতের রায়সমূহ উপেক্ষা না করে দখল ছেড়ে দিতে বলতো না। তবে কি তারা ভবনটিকে শাইখ রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করতেন, না অন্য কিছু? এ প্রশ্নের জবাব শাইখ রহিমাহুল্লাহর ও শাইখপরিবারের অন্ধভক্তরা কিংবা মুফতী মনসূরুল হক সাহেব ও মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবের প্রতি ঈর্ষাকাতর লোকেরাই ভালো দিতে পারবেন।

আরও অবাক কাণ্ড হল, ১৯/০৭/২০২১ তারিখে সম্পূর্ণ আইনী ভিত্তিতে এবং দখলদারদের সুদিনে দেয়া রায়ের ভিত্তিতেই জনমানবশূন্য ভবনটি ঢাকা জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেট ও ওয়াকফ প্রশাসক কর্তৃক বৈধ কর্তৃপক্ষ ও মুতাওয়াল্লীকে বুঝিয়ে দেয়া হল, তখনও সেই মুফতী মনসূরুল হক সাহেব আর হিফজুর রহমান সাহেবরাই হলেন গালাগাল, কটূক্তি আর অপবাদের শিকার। একদিকে তাদের দু'-চারটি শব্দের ছাল তুলে দেশব্যাপী কাদা ছিটানো হচ্ছে, অপরদিকে বিশ বছর আগে যাদের জন্মও হয়নি কিংবা যারা ছিল দুগ্ধপোষ্য তাদের অশালীন ও অশ্রাব্য গালি-গালাজের ব্যাপারে মুখে একদম কুলুপ। কারণ হিসেবে বলা হয়, তারা নাকি মজলুমের পক্ষে, আর মজলুমের পক্ষ নিয়ে নাকি যা ইচ্ছা বলা জায়েয। অথচ ২০২১ সালের এই মজলুমদের হাতে ০৩/১১/২০০১ সালে মুফতী মনসূরুল হক সাহেব, মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব ও তাঁদের সহকর্মীগণ কী পরিমাণ মজলুম হয়েছিলেন তা চিন্তা করলেও গা শিউরে ওঠার কথা!

মনে রাখতে হবে, বিগত প্রজন্মের জন্য হযরত শাইখুল হাদীস রহিমাহুল্লাহর মতো ব্যক্তিবর্গ যেমন ছিলেন আলেমসমাজ ও মুসলিম জাতির শ্রদ্ধার পাত্র, বর্তমান প্রজন্মের জন্যও মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. ও মাওলানা হিফজুর রহমান দা.বা.-এর মতো প্রাজ্ঞ আলেমগণ সে স্তরের শ্রদ্ধার পাত্র।

উল্লেখ্য, হক-বাতিলের মাপকাঠি কারও ব্যক্তিত্ব বা নিছক জনশ্রুতি নয়। হক-বাতিলের মাপকাঠি শরীয়ত ও শরীয়তস্বীকৃত প্রচলিত আইন। শরীয়ত ও শরীয়তসম্মত আইনের আলোকে জামিআ রাহমানিয়া কর্তৃপক্ষ দখলদার নাকি হকদার, জালেম নাকি মজলুম বিষয়টি প্রমাণ হওয়া দরকার। আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মূলত এটাই।

মিডিয়া ও ব্যক্তিপূজারীদের হাতে মুফতী মনসূরুল হক সাহেব, মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব ও তাদের সহকর্মীগণ আজ চরমভাবে মজলুম। মজলুমের আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার আছে। এই বই কারও গীবত গাওয়া বা কারও বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়ার জন্য নয় বরং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য। তবে প্রতিপক্ষ যদি রাহমানিয়া কর্তৃপক্ষের দ্বারা মজলুম হওয়ার দাবী রাখেন তাহলে তারাও তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রমাণাদি পেশ করতে পারেন। প্রমাণ পেশ করতে পারলে রাহমানিয়া কর্তৃপক্ষ সেটার প্রতিকার করতে প্রস্তুত আছে। কারণ সকলকেই কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। সেখানে শুধু সুনাম-সুখ্যাতি ও বংশের মানদণ্ডে বিচার হবে না। বরং হক ও না-হকের ভিত্তিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, এক ময়দানের কৃতিত্ব আরেক ময়দানের অন্যায়কে বৈধ করে দেয় না। প্রত্যেক ন্যায়-অন্যায়ের পৃথক পৃথক হিসাব নেয়া হবে।

তথ্য-উপাত্ত ও উদ্ধৃতির কারণে কলেবর একটু বড় হলেও রাহমানিয়া কর্তৃপক্ষের সমর্থক কিংবা সমালোচক সকলেরই এ বই পড়া উচিৎ। এতে কারও জানার ঘাটতি দূর হবে, কারও ভুল সংশোধন হবে, কেউ বদযুবানী ও বদগুমানী থেকে রক্ষা পাবেন। আর কেউ যদি মনে করেন, এর কোন অংশে ভুল তথ্য পেশ করা হয়েছে তাহলে তিনি আমাদেরকে সঠিক তথ্য দিয়ে সংশোধন করার সাওয়াব পাবেন। কেননা, এটি হল প্রাথমিক ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। আর মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়।

মোটকথা, বইটি রাহমানিয়া কর্তৃপক্ষের আত্মপক্ষ সমর্থন, নিরপেক্ষ আলেমসমাজের নিকট বিনীত নিবেদন এবং প্রতিপক্ষের নিকট উদাত্ত আহ্বান।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাঁর দীনের আমানত রক্ষা করার কাজে অংশগ্রহণের তাওফীক দান করুন। আ-মীন।

লালবাগ জামিআ। ছাত্ররাজনীতির অমানিশা। মুরুব্বীদের অবস্থান। লালবাগ ত্যাগ। মুহাম্মাদিয়া প্রতিষ্ঠা। মুহাম্মাদিয়া ত্যাগ। জামিআ রাহমানিয়ার সূচনা। গঠনতন্ত্র। জমি সংগ্রহ। ওয়াকফ বিবরণ। ভবন নির্মাণ। অভ্যন্তরীণ যিম্মাদার। পরিচালনা কমিটি প্রভৃতি

ছাত্ররাজনীতির ভয়াবহতায় লালবাগ জামিআ এবং মুহাদ্দিস সাহেব রহিমাহুল্লাহ

বাংলার বুকে ঐতিহ্যবাহী একটি প্রতিষ্ঠান জামিআ কুরআনিয়া লালবাগ। তালীম-তরবিয়ত, ইলমে নববীর প্রচার-প্রসার এবং বিশুদ্ধ দীন প্রতিষ্ঠায় এটি ছিল বিশ্বমানের বিদ্যাপীঠ। এর সুনাম-সুখ্যাতি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশের মাটিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৫০ ঈসায়ী সনে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে হযরত ছদর সাহেব আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী রহিমাহুল্লাহ ছিলেন এর মুহতামিম (প্রিন্সিপ্যাল)। আর আল্লামা হেদায়াতুল্লাহ মুহাদ্দিস সাহেব রহিমাহুল্লাহ ছিলেন ছদর সাহেবের নিযুক্ত নায়েবে মুহতামিম (ভাইস প্রিন্সিপ্যাল)। হযরত ছদর সাহেব রহিমাহুল্লাহ ছিলেন জাতীয় ব্যক্তিত্ব ও অত্যন্ত কর্মব্যস্ত মানুষ। এজন্য মুহাদ্দিস সাহেব রহিমাহুল্লাহর মাধ্যমে তিনি জামিআর ইহতিমামের যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। ১৩৮৮ হিজরী সনের ৬ যিলকদ মোতাবেক ১৯৬৯ সালের ২১ জানুয়ারীতে হযরত ছদর সাহেব রহিমাহুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। হযরতের ইন্তেকালের নিকটবর্তী সময় যখন লালবাগের পরবর্তী মুহতামিম নিয়োগ নিয়ে আলোচনা চলছিল তখন ছদর সাহেব রহিমাহুল্লাহ গহরডাঙ্গা থেকে খামবন্ধ একটি চিঠি লালবাগে প্রেরণ করেন এবং বলে দেন যে, চিঠিটি যেন তার ইন্তেকালের পর খোলা হয়। তাতে লেখা ছিল, *"আমার পরবর্তী মুহতামিম হবেন মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ।"*

হযরত মুহাদ্দিস সাহেব রহিমাহুল্লাহ হযরত ছদর সাহেব রহিমাহুল্লার ইন্তেকাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৯ বছর নায়েবে মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন। আর হযরত ছদর সাহেব রহিমাহুল্লাহর ইন্তেকালের পর ১৩৮৮ হিজরী সনের ৬ যিলকদ থেকে নিয়ে ১৪০৪ হিজরী সনের ৩০ রমাযান পর্যন্ত ১৬ বছর মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন। (১৯৬৯ ঈসায়ীর ২১ জানুয়ারি থেকে ১৯৮৪ ঈসায়ীর ৩০ জুন)।

হযরত মুহাদ্দিস সাহেব রহিমাহুল্লাহ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সর্বমোট ৩৪ বছর পর্যন্ত দুনিয়ার সবকিছু এমনকি আপন পরিবার-পরিজন থেকেও অধিক আপন করে নিয়েছিলেন লালবাগ জামিআকে। গভীর মমতা, নিখাদ ইখলাস, প্রখর মেধা, সঠিক সিদ্ধান্ত, অক্লান্ত পরিশ্রম ও শেষ রাতের রোনাজারীর মাধ্যমে তিনি লালবাগ জামিআকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন এবং ইলমী, আমলী ও আখলাকী সর্বদিক দিয়ে এটিকে বিশ্বের অন্যতম বিদ্যাপীঠে পরিণত করেছিলেন।

১৯৮১ সালের কথা। লালবাগ জামিআর শিক্ষা-দীক্ষার সুনাম তখন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। এ সময় ১৪০১-১৪০২ হিজরী শিক্ষাবর্ষের শুরুতে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহিমাহুল্লাহ দেশব্যাপী তাওবার রাজনীতির ডাক দিয়েছিলেন। উস্তাদগণের কিছু সংখ্যক এবং ছাত্রদের একটা বিরাট অংশ সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিল। মিটিং-মিছিল ইত্যাদি কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও সফল করার জন্য তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হতো। ১৪০৪ হিজরী শিক্ষাবর্ষে এসে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটনা অনেকদূর গড়িয়ে যায়। হযরত মুহাদ্দিস সাহেব রহিমাহুল্লাহ যখন বুঝেছেন, মাদরাসায় তালীমী পরিবেশের উপর রাজনীতি প্রাধান্য লাভ করেছে ফলে এখানে থেকে প্রশান্তচিত্তে তালীমী খিদমত আঞ্জাম দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়; নিরাশ হয়ে সম্পূর্ণ নীরবে লালবাগ জামিআ ছেড়ে চলে যান। হযরত মুহাদ্দিস সাহেব হুযূর রহিমাহুল্লাহর চলে যাওয়ার পর লালবাগ জামিআর সার্বিক অবস্থা আগের মত থাকেনি এবং এরপর আর কখনো সেখানে পূর্বের ঐতিহ্য ফিরে আসেনি। বস্তুত ছাত্ররাজনীতির ভয়াবহতাই ছিল এর মূল কারণ।

হযরত মুহাদ্দিস সাহেব রহিমাহুল্লাহর চলে যাওয়ার পর লালবাগ জামিআর ইহতেমামের দায়িত্ব অর্পিত হল প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহিমাহুল্লার উপর। আসলে মুহাদ্দিস সাহেব রহিমাহুল্লাহর চলে যাওয়ার বছরটি ছিল লালবাগ জামিআর শোকের বছর। একদিকে হযরত মুহাদ্দিস সাহেব হুযূর লালবাগ ছেড়ে চলে গেলেন, অপরদিকে এক মাসের মধ্যেই মুহাদ্দিস সাহেব হুযূরের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি, লালবাগ জামিআর প্রধান মুফতী আব্দুল মুইয সাহেবও ইন্তেকাল করেন। লালবাগ জামিআর জন্য এটি ছিল আরেকটি বিশাল ধাক্কা। আবার এ বছরই জনৈক ব্যক্তির একমাত্র সন্তান মাদরাসার কাজে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইন্তেকাল করে, যা দুঃখ-বেদনার বোঝা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই সবগুলো বিষয় ছিল জামিআর শিক্ষক-ছাত্র সকলের জন্য অত্যন্ত কষ্ট ও সীমাহীন বেদনার। ফলে সকলেই ছিলেন যারপরনাই মর্মাহত ও মনমরা।

এদিকে মুফতী আব্দুল মুইয সাহেব রহিমাহুল্লাহ ইন্তেকাল করায় নাযেমে তালীমাতের পদ শূন্য হয়ে পড়ে। ওদিকে লালবাগ জামিআর আরেক প্রাণপুরুষ মাওলানা সালাহউদ্দীন সাহেব রহিমাহুল্লাহ ছিলেন নাযেমে দারুল ইকামা (হলসুপার); তিনিও চলে গেলেন মুহাদ্দিস সাহেব হুযূর রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে। ফলে দারুল ইকামার যিম্মাদারীও ঠিক মতো পালিত হচ্ছিল না। এতো সুশৃঙ্খল একটি জামিআ, যা ছিল যুগ যুগ ধরে তালীম-তরবিয়ত ও উন্নত ব্যবস্থাপনায় ঈর্ষণীয়, হঠাৎ যেন স্থবির হয়ে পড়ল। এ অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ যিম্মাদারীগুলো অঘোষিতভাবে জামিআর নবীন উস্তাদ মুফতী মনসূরুল হক সাহেব এবং মাওলানা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী সাহেব আঞ্জাম দিতে শুরু করেন। শিক্ষকতায় নবীন হলেও ছাত্রদের তালীম-তরবিয়ত ও নিরলস নেগরানীতে তারা ইতোমধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন এবং সাবলীল উপস্থাপনা ও আকর্ষণীয় আঙ্গিকে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টায়ও ছিলেন প্রসিদ্ধ। উপরন্তু আইন-কানুনের পাবন্দ ও নীতিবান শিক্ষক হিসেবে ছিলেন গ্রহণযোগ্য ও সর্বস্বীকৃত।

মুহাম্মদপুরে জামিআ মুহাম্মাদিয়া প্রতিষ্ঠা

১৯৮৬ সনের রমাযান মাস। নন্দিত বিদ্যাপীঠ জামিআ কুরআনিয়া লালবাগ অকস্মাৎ এক ঘোষণায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। সক্রিয় রাজনীতির অনিবার্য পরিণতি অভ্যন্তরীণ

দ্বন্দ্ব-নির্ভর পারস্পরিক বিভাজন ও বিভক্তির ফলে শিক্ষক-ছাত্র সকলেই চলে গেল যার যার মতো। জামিআর দীর্ঘদিনের শাইখুল হাদীস, বুখারী শরীফের সর্বপ্রথম বাংলা-ভাষ্যকার, প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা আজিজুল হক রহিমাহুল্লাহও চলে গেলেন আজিমপুরের বাসায়। শাইখ রহিমাহুল্লাহ যেহেতু এ সময় লালবাগ জামিআ ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সম্পৃক্ত ছিলেন না, শুধু জামিআ ইসলামিয়া তাঁতিবাজার এবং জামিআ নূরিয়া কামরাঙ্গীরচরে দুই-একটি ক্লাস নিতেন, আবার নূরিয়া থেকেও অল্প ক"দিন পূর্বে চলে এসেছিলেন, তাই লালবাগ জামিআ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা নিয়ে ভাবনামগ্ন ছিলেন এবং নিজ বাসাতেই অবস্থান করছিলেন। শোনা যায়, আশিকে কুরআন শাইখ রহিমাহুল্লাহ এ সময় দিনে একবেলা পথশিশুদের আদর-যত্ন করে বাসায় এনে কুরআন পড়া শিখাতেন।

শাইখ রহিমাহুল্লাহর প্রিয় ছাত্র ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, জামিআর নবীন শিক্ষক মুফতী মনসূরুল হক সাহেবও চলে আসলেন জামিআ ছেড়ে। নবীন হলেও লালবাগ জামিআয় সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা, অভিনব শিক্ষাদানপদ্ধতি, ছাত্রগড়ার কলাকৌশল, কেল্লার মসজিদে ইমামতি ইত্যাদির সুবাদে একদিকে যেমন জামিআর কর্ণধার ও মুরুব্বী শিক্ষকদের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল, অপরদিকে ছাত্রদের মধ্যেও ছিলেন সমাদৃত এবং মুসল্লীদের নিকটও ছিলেন জনপ্রিয়। কেল্লার মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব থাকায় জামিআ বন্ধ হওয়ার পর তিনি বাড়িতে ফিরে যাননি; ইমামতের দায়িত্ব পালনার্থে থেকে গিয়েছিলেন লালবাগের ভাড়া-বাসায়। বাসার মালিক ছিলেন শায়খুল হাদীস রহিমাহুল্লাহর জামাতা মাওলানা গিয়াসুদ্দীন দা.বা.। মুফতী মনসূরুল হক সাহেব এবং তার আজীবনের সহকর্মী, মুহাদ্দিস সাহেব হুযূর রহিমাহুল্লাহর সুযোগ্য সন্তান, মানুষগড়ার আরেক কারিগর মাওলানা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী সাহেবও মাওলানা গিয়াসুদ্দীন সাহেবের এই বাসায় আগে সপরিবারে ভাড়া থাকতেন। যাই হোক, অনির্দিষ্টকালের জন্য লালবাগ জামিআ বন্ধ হওয়ার কারণে মুফতী মনসূরুল হক সাহেবও ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। এ সময় কেউ কেউ তাকে কিতাবাদি রচনা ও লেখালেখির কাজে আত্মনিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু যিনি ছাত্রগড়ার স্বভাবজাত কারিগর তার জন্য কিতাব-ছাত্রের সঙ্গবিহীন জীবন কাটানো তো অসম্ভব!

শাইখ রহিমাহুল্লাহর আরেক প্রিয় ছাত্র, ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, নিজ উস্তাদ মুহাদ্দিস সাহেব হুযূর রহিমাহুল্লাহর মেজো পুত্র, হাফেজ্জী হুযূর রহিমাহুল্লাহর ভাগিনা হলেন মাওলানা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী সাহেব। প্রচণ্ড মেধাবী, প্রাজ্ঞ, নীতিবান, কর্মঠ নবীন আলেমেদীন। ইতোমধ্যে লালবাগ জামিআয় ৬ বছর ধরে নীতিবান ও কর্মঠ শিক্ষকরূপে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বীয় পিতা মুহাদ্দিস সাহেব হুযূর লালবাগ জামিআ ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের সঙ্গে তিনিও অভ্যন্তরীণ দায়–দায়িত্ব দেখভাল করে আসছেন। দরস-তাদরীসের ক্ষেত্রেও ছাত্রদের নিকট প্রিয় হয়ে উঠেছেন। তিনিও লালবাগ জামিআ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সীমাহীন বিচলিত ও পেরেশান। এই দুজন ছাড়াও লালবাগ জামিআর প্রবীন কিছু আসাতিযায়ে কেরাম যারা শাইখ রহিমাহুল্লাহ-এর যোগ্যতায় মুগ্ধ ছিলেন এবং পড়ালেখার সুশৃঙ্খল পরিবেশপ্রিয় ছিলেন তারাও লালবাগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যারপরনাই চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়েন।

মাওলানা আবুল কালাম সাহেব। হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহিমাহুল্লাহর খেলাফত আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। কেল্লার মোড়ে অবস্থিত খেলাফত আন্দোলনের তৎকালীন কেন্দ্রীয় অফিসে কর্মরত। হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহিমাহুল্লাহর বিশেষ স্নেহভাজন। মুফতী মনসূরুল হক সাহেব যেহেতু শাইখুল হাদীস রহিমাহুল্লাহর আস্থাভাজন সহকর্মী এবং হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর বয়ানের তরজুমান (ভাষ্যকার) ছিলেন সে সুবাদে আবুল কালাম সাহেব এবং মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের মাঝে জানাশোনা ছিল। এদিকে মুহাম্মদপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মোহাম্মদী হাউজিং লিমিটেডের চেয়ারম্যান হাজী সিরাজুদ্দৌলা সাহেবের সঙ্গে ছিল মাওলানা আবুল কালাম সাহেবের ঘনিষ্ঠতা।

যেহেতু লালবাগ থেকে শায়খুল হাদীস আজিজুল হক সাহেব মুফতী মনসূরুল হক সাহেব এবং একদল দক্ষ উলামায়ে কেরাম বের হয়ে গিয়েছেন এবং লালবাগ জামিআয় তাদের ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে, তাই আবুল কালাম সাহেব চিন্তা করলেন, এখনই এসব মশহুর ও যোগ্য উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে একটি দীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মোক্ষম সময়।

সে বিবেচনায় প্রাথমিকভাবে তিনি মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং হাজী সিরাজুদ্দৌলা সাহেবের পক্ষ থেকে মুফতী মনসূরুল হক সাহেবকে রাজি করানোর চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে মুফতী সাহেব যখন হাজী সিরাজুদ্দৌলা সাহেবের সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে মাদরাসা করার ব্যাপারে সম্মত হন তখন মাওলানা আবুল কালাম সাহেবের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক বৈঠক শেষে লালবাগ থেকে হেঁটে হেঁটে মুহাম্মদপুর চলে আসেন। হাজী সিরাজুদ্দৌলা সাহেবও হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহিমাহুল্লাহর সুবাদে মুফতী সাহেবকে চিনতেন। মুহাম্মদপুরে এসে তিনি হাজী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ ব্যাপারে মুফতী সাহেব বলেন, *নতুন মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হাজী সিরাজুদ্দৌলা সাহেবের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং এ বিষয়ে হাজী সাহেবের সঙ্গে পরপর তিনদিন বৈঠক হয়। তিনি বলছিলেন, আমি তিন লক্ষ টাকা দিচ্ছি, আপনি মাদরাসা শুরু করুন। কেন যেন আমি হাজী সাহেবের প্রতি তেমন আস্থাশীল হতে পারছিলাম না তাই বললাম, প্রথমে মাদরাসার রূপরেখা কী হবে সেটা ঠিক করতে হবে, কমিটি গঠন করতে হবে এবং মাদরাসার নাম ঠিক করতে হবে। উপরন্তু মাদরাসার অভ্যন্তরে কে কোন দায়িত্ব পালন করবে সেটাও ঠিক করতে হবে। যখন এই সবগুলো বিষয় চূড়ান্ত হবে তখন মাদরাসা শুরু করব। তারপর হাজী সিরাজুদ্দৌলা সাহেব যখন কমিটি গঠন ও অন্যান্য বিষয়ে সম্মত হলেন তখন আমি শাইখুল হাদীস সাহেবসহ আমরা যারা একই চিন্তা-চেতনা ও মেযাজ-রুচির ধারক ছিলাম সকলকে নতুন মাদরাসার কথা জানাতে থাকি।*

লালবাগের যেসব ছাত্র আমাদেরকে মহব্বত করতো, একান্তভাবে আমার ও মাওলানা হিফজুর রহমান মুমিনপুরীর ভক্ত ছিলো এবং শাইখুল হাদীস সাহেব হুযূরের কাছে বুখারী শরীফ পড়ার জন্য ব্যাকুল ছিল, বিশেষত মেশকাত জামাআতের আব্দুল কাইয়ুম মীযান, মুযযাম্মিলুল হক গাজীপুরী, হেলালুদ্দীন আহমাদ গাজিপুরী, অন্য জামাআতের ছাত্র মুনাওওয়ার হুসাইন– এরা রমাযান থেকেই মুহাম্মদপুর আসা-যাওয়া করছিল এবং আমাদের থেকে মাদরাসার বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখছিল। তখন তো আর মোবাইল ছিল না যে, যখন-তখন সবাইকে সবকিছু জানিয়ে শুরু করা যাবে। তাই যখন মাদরাসার প্রাথমিক বিষয়গুলো মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল, তখন আমি শাইখুল হাদীস রহিমাহুল্লাহকে জানানো এবং আনার জন্য মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম মীযান, মাওলানা মুযযাম্মিলুল হক গাজীপুরী, মাওলানা

মুনাওওয়ার হুসাইন এবং লালবাগ জামিআর দীর্ঘদিনের দফতরী হায়দার আলীকে হুযুরের বাসায় পাঠাই। হুযুর প্রথমে রাজী হননি। জাতীয় পর্যায়ের দীনি যিম্মাদারী, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের বিভিন্ন ব্যস্ততা এবং কিছুটা বয়সের তাকাযার কারণে নতুন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যস্ততায় তিনি সম্পৃক্ত হতে চাচ্ছিলেন না। হুযুর বলছিলেন, আমার এখন মাদরাসা করার বয়স নেই; কমজোর হয়ে গেছি। অতঃপর যাদেরকে হুযুরের কাছে পাঠিয়েছিলাম তারা যখন হুযুরের রাজি না হওয়ার কথা জানাল, আমি তাদেরকে শিখিয়ে দিলাম যে, এবার গিয়ে হুযুরকে বলবে, হুযুর! আপনি মুরুব্বী ও শাইখ হিসেবে থাকবেন। শুধু একটা ক্লাস করাবেন। অন্য কোন যিম্মাদারীর পেরেশানী আপনার উঠাতে হবে না; সেগুলো মনসুর সাহেব দেখবেন। তারপরই মূলত হুযুর রাজি হন আলহামদুলিল্লাহ। আর হুযুরের রাজী হওয়াটা ছিল আমাদের জন্য বিশাল নেয়ামত!

তারপর শাইখুল হাদীস সাহেব হুযুর মুহাম্মদপুর আসলেন। এদিকে মুফতী মনসূরুল হক সাহেব তার দীর্ঘদিনের সহকর্মী এবং লালবাগের কঠিন দিনগুলোর একান্ত সঙ্গী মাওলানা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী সাহেবকে লোক মারফৎ সংবাদ পাঠান। তিনি তখন নিজ এলাকা চাঁদপুরে অবস্থান করছিলেন। সংবাদ পাওয়ামাত্র ঐদিনই তিনি চাঁদপুর থেকে রওয়ানা হয়ে মুহাম্মদপুর চলে আসেন এবং নতুন মাদরাসার কাজে যোগদান করেন।

যাই হোক, মুফতী সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী– *অতঃপর হাজী সিরাজুদ্দৌলা সাহেব কমিটি গঠনের জন্য একটি বৈঠক ডাকলেন। সেখানে শাইখুল হাদীস সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন তদানীন্তন বাইতুল মোকাররম মসজিদের খতীব মরহুম উবাইদুল হক সাহেব এবং এমন কিছু ব্যক্তিবর্গ যাদের সঙ্গে সে বৈঠকেই আমার প্রথম মুলাকাত হয়। উদাহরণ স্বরূপ আলহাজ্ব আব্দুল মালেক সাহেব, আলহাজ্ব আব্দুল মতীন সাহেব প্রমুখ। এরা মূলত হাজী সিরাজুদ্দৌলা সাহেবের পরিচয়সূত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর এদেরকে নিয়েই নতুন মাদরাসার কমিটি গঠন করা হয়। সে বৈঠকেই রাজনীতিতে ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হয়েছিল। আলোচনার ধরনটা ছিল এমন–*

আলহাজ্ব আব্দুল মালেক সাহেব হাজী সিরাজুদ্দৌলা সাহেবকে প্রশ্ন করছিলেন, মাদরাসা কোন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে? হাজী সিরাজুদ্দৌলা সাহেব বললেন, আপাতত আমার বিল্ডিংয়ে চলবে। পরে আমার হাউজিং থেকে চার বিঘা জায়গা দিয়ে দিব। অতঃপর আলহাজ্ব আব্দুল মালেক সাহেব শাইখুল হাদীস সাহেবকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন, আপনি তো রাজনীতি করেন, এই (নতুন) মাদরাসায় রাজনীতি চলবে কিনা? শাইখুল হাদীস সাহেব বললেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতি করলেও মাদরাসার ভেতরে কোন রাজনীতি চলবে না। লালবাগ জামিআ তো এজন্যই বিভক্ত হয়েছে। শাইখুল হাদীস সাহেব আরো বললেন, কোন ছাত্র আমার দলের রাজনীতি করলেও বহিষ্কার করে দিব। তখন মরহুম খতীব ওবায়দুল হক সাহেব বললেন, এটা কি করে সম্ভব, আপনি করবেন সাওয়াবের কাজ আর আপনার ছাত্ররা তা করবে না? শাইখুল হাদীস সাহেব বললেন যে, না, আমি করলেও ছাত্ররা করতে পারবে না। তখন আলহাজ্ব আব্দুল মালেক সাহেবসহ অন্যান্যরা আশ্বস্ত হলেন।

আলোচনার পর প্রতিষ্ঠানের নাম নির্ধারিত হয় জামিআ মুহাম্মদিয়া আরাবিয়া। সে সময় হাজী সিরাজুদ্দৌলা সাহেবের তত্ত্বাবধানে বর্তমান জামিআ মুহম্মদিয়ার অবস্থানে একটি দোতলা বিল্ডিংয়ের নিচতলায় মক্তব চলছিল। সেখানেই ১৯৮৬ সনের শাওয়াল মাসে শুরু হয় জামিআ মুহাম্মদিয়া আরাবিয়ার পথচলা। তারপর পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকেই শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেবকে প্রশাসনিক যিম্মাদারী থেকে মুক্ত রেখে তাকে মাদরাসার প্রধান মুরুব্বী ও শাইখ আর মুফতী মনসূরুল হক সাহেবকে ভারপ্রাপ্ত মুহতামিম নির্ধারণ করা হয়। এভাবে মাদরাসার কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। যদিও তখন স্বয়ং শাইখুল হাদীস সাহেবের প্রস্তাবে মুফতী মনূরুল হক সাহেব (ভারপ্রাপ্ত) মুহতামিম নিযুক্ত হন, তবে মুফতী সাহেবের বয়স কম হওয়ায় কিছুদিন পর মাওলানা আব্দুল গাফফার সাহেবকে মুহতামিম এবং মুফতী সাহেবকে নায়েবে মুহতামিম নিযুক্ত করা হয়।

সে সময় লালবাগ জামিআ থেকে শাইখুল হাদীস সাহেব, মুফতী মনসূরুল হক সাহেব এবং মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবসহ আরও যেসব আসাতিযায়ে কেরাম চলে আসেন তাদের অন্যতম হলেন– হযরত মাওলানা আলী আসগর সাহেব, হযরত মাওলানা আব্দুল রহমান সাহেব, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব, হযরত মাওলানা গোলাম মাওলা সাহেব, মাওলানা আব্দুল মজীদ ফিরোজী সাহেব। এছাড়াও মুহাম্মদপুর থেকে যুক্ত হন মাওলানা আবুল কালাম সাহেব। তিনি প্রাথমিক জামাআতের দরস দিতেন এবং জামিআ মুহাম্মাদিয়া প্রতিষ্ঠার সূচনাতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। লালবাগ ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে যারা মুহাম্মাদিয়ায় এসে সম্পৃক্ত হন তারা হলেন– মাওলানা বাহাউদ্দীন গাজীপুরী প্রমুখ। মোটকথা, বিগত সময়ে লালবাগের শেষপর্যায়ে যারা উল্লিখিত মুরুব্বীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও একাত্ম ছিলেন এমন ছাত্র-উস্তাদ সকলেই একে একে জামিআ মুহাম্মদিয়ায় এসে জড়ো হতে থাকেন।

রাহমানিয়ার সূচনা

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেব, মুফতী মনসূরুল হক সাহেব, মাওলানা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী সাহেব, মাওলানা আব্দুল গাফফার সাহেব ও মাওলানা আলী আসগর সাহেবসহ যে সকল বিদগ্ধ ও কর্মবীর উলামায়ে কেরাম জামিআ মুহাম্মাদিয়া নামে নতুন প্রতিষ্ঠান চালু করেছিলেন এবং স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, ঐতিহ্যবাহী লালবাগ জামিআর তালীম-তরবিয়তের সেই স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনবেন এবং গড়ে তুলবেন নিজস্ব জমিতে একটি স্বতন্ত্র আদর্শ প্রতিষ্ঠান; একপর্যায়ে তারা লক্ষ্য করলেন, প্রতিষ্ঠানের সূচনালগ্নে দেয়া হাজী সিরাজুদ্দৌলা সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলো একে একে ভঙ্গ হচ্ছে এবং সহযোগিতার যে সকল আশ্বাস তিনি দিয়েছিলেন ক্রমান্বয়ে তার ব্যতিক্রম হচ্ছে, ফলে বিঘ্ন হচ্ছে লেখাপড়ার পরিবেশ এবং বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সার্বিক কার্যক্রম, তখন মুরুব্বিয়ানে কেরাম ভিন্ন চিন্তা এবং ভিন্ন ফিকির করতে শুরু করলেন। ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনা-পর্যালোচনার একপর্যায়ে তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এখানে অবস্থান করে কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ফলে জামিআ মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া নামের প্রতিষ্ঠানটিতে সূচনার দুই বছরের মাথায় বিভাজন ও বিভক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে।

জামিআ মুহাম্মাদিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে আসাতিযায়ে কেরাম ও মাদরাসার কমিটির অধিবেশন থেকে যা জানা যায় তার বিবরণ এই–

"যদিও জামেয়া মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার কার্যক্রম হাজী সিরাজুদ্দৌলাহ ছাহেবের বাসায় আরো এক বৎসর চলার সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিন্তু হাজী সিরাজুদ্দৌলাহ ছাহেব পরবর্তীতে তাহার বাসা ব্যবহার করিতে দিতে অস্বীকার করায় এমনকি উক্ত

জামেয়াকে তাহার বাসার নিকটবর্তী এলাকায় ও মুহাম্মদিয়া হাউজিং এর অন্তর্ভুক্ত এলাকায় না করিয়া বরং সাতমসজিদ এলাকার দিকে করার পরামর্শ দেন। এবং বিগত ২২/০৫/১৯৮৮ ঈসায়ী তারিখে লালবাগ চাঁনতারা মসজিদে শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আজিজুল হক ছাহেব, জনাব মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ ছাহেব, জনাব হাজী রফীকুদ্দীন ছাহেব ও জনাব হাজী সিরাজুদ্দৌলাহ ছাহেব এক বৈঠকে মিলিত হন। উক্ত বৈঠকে জনাব হাজী সিরাজুদ্দৌলাহ ছাহেব লিখিতভাবে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন যে, জামেয়া মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়াকে অতিসত্বর স্থানান্তরিত করিতে হইবে এবং সে জন্য নতুন যে বিল্ডিং ভাড়া নেওয়া হইবে উক্ত বিল্ডিং-এর তিন মাসের ভাড়া জনাব হাজী সিরাজুদ্দৌলাহ ছাহেব নিজেই বহন করবেন...। তিনি মৌখিকভাবে আরো ওয়াদা করেন যে, জামেয়া মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া তাহার বাসায় থাকাকালীন যে সমস্ত কিতাব-পত্র ক্রয় করা হয়েছিল বা দানে পাওয়া গিয়েছিল এবং অন্যান্য আসবাবপত্র সবকিছু স্থানান্তরিত জামেয়াকে বুঝাইয়া দিবেন। এমনকি তিনি নিজেই স্থানান্তরিত জামেয়ায় "জামেয়া মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া" নামে নতুনভাবে সাইনবোর্ড লিখাইয়া লটকাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। এবং তাহার বাসার পুরাতন সাইনবোর্ডটি তিনি অকেজো করিয়া দিবেন।" (কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশন: অধিবেশন-১, তারিখ: ৫/৬/১৯৮৮ খ্রি.)

কমিটি হাজী সিরাজুদ্দৌলা সাহেবের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে মেনে নেন এবং মাদরাসা স্থানান্তরের জন্য একটি সাবকমিটি গঠন করেন। এ প্রসঙ্গে কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশন এই–

"উপরোক্ত বিষয়াবলী বিবেচনা করিয়া শায়খুল হাদীস ছাহেবের নেতৃত্বে একটি সাব-কমিটি গঠন করিয়া সাত মসজিদের নিকটে জামেয়ার নিমিত্ত বিল্ডিং ভাড়া করার অনুরোধ করা হয়। সেই মোতাবেক বিল্ডিং ভাড়া করিয়া জামেয়া মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়াকে স্থানান্তরিত করিয়া ছাত্র ভর্তি শুরু করা হয়। অদ্যকার এই সভা সর্বসম্মতিক্রমে ভাড়াকৃত নতুন বিল্ডিংএ জামেয়ার স্থানান্তরকে অনুমোদন দান করিতেছে।" (কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশন: অধিবেশন-১, তারিখ: ৫/৬/১৯৮৮ খ্রি.)

কিন্তু কৃতচুক্তি ভঙ্গ করে হাজী সিরাজুদ্দৌলা সাহেব তার বাসায় জামেয়া মুহাম্মাদিয়া নামে মক্তব থেকে দাওরা পর্যন্ত যথারীতি মাদরাসার কার্যক্রমের ঘোষণা দেন এবং প্রচারপত্র বিতরণ করেন। ফলে কিছুদিন পর স্থানান্তরিত জামেয়া মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার নাম পরিবর্তন করতে হয়। পরিবর্তিত সেই নামই হলো "জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া"।

রেজুলেশনের পাঠ নিম্নরূপ– *"জামেয়ার নতুন নাম "জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া" (সাত মসজিদ মাদ্রাসা) বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইল।"*(কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশন: অধিবেশন-৩, ধারা-২, তারিখ: ১/৭/১৯৮৮ খ্রি.)

যখন উল্লিখিত স্থানান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয় এবং ছাত্রদের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়ে কোটা পূর্ণ হয়ে যায় তখন ২৭ শাওয়াল মোতাবেক ১৩ জুন ১৯৮৮ ঈসায়ী সোমবার বিকাল চারটায় জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার প্রথম সবক উদ্বোধন করা হয়।

যেভাবে গড়ে উঠল জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া

তদানীন্তন সময়ে মক্তব থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য বাসা খুঁজে পাওয়া ছিল অত্যন্ত দুষ্কর। তাই জামিআর দায়িত্বশীল সকলেই পেরেশান হয়ে পড়েন এবং খুঁজতে থাকেন নিজস্ব জায়গা।

সাত-মসজিদ এলাকাটি তখন আজকের মতো আবাদ ছিল না। একদিকে ঐতিহাসিক সাতমসজিদ, অপরদিকে বসিলা গ্রাম আর মাঝখানের পুরোটাই ডোবা-জলাশয়। ভরা বর্ষায় জলাশয়ের ঢেউগুলো সাতমসজিদের সীমানাপ্রাচীরে আছড়ে পড়তো। দূরপাল্লার মাঝিমাল্লারা নৌকা ভিড়িয়ে জিরিয়ে নিতো মসজিদঘাটে। এখানে একদিন ইলমী কানন গড়ে উঠবে, কুরআন-হাদীস অন্বেষীদের গুঞ্জরণে মুখরিত হবে চারদিক, তখনকার অবস্থা দেখে কেউ কল্পনাও করতো না। ষোড়শ শতাব্দীর এই পুরাকীর্তি এভাবে অনাবাদ পড়ে থাকবে, রব্বে কারীমের ইচ্ছা হয়তো সেটি ছিল না। ফলে একসময় সাতমসজিদ ঘিরে গড়ে উঠল নন্দিত বিদ্যাপীঠ– জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

যেভাবে শুরু

সাতমসজিদ এলাকার সম্পদশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন হাজী নূর হোসেন সাহেব এবং তার বড় ভাই হাজী মোহাম্মদ আলী। তারা দুজনেই ছিলেন আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট-এর মালিক। তখনকার সময়ে সাতমসজিদের খিদমতে বা আশপাশে অবস্থান করতেন সিলেটের মাওলানা আবুল কালাম সাহেব। তিনি সিলেটের বিখ্যাত বুযুর্গ আল্লামা গহরপুরী হুযূরকে বিভিন্ন সময় দীনী প্রোগ্রামে সাত মসজিদে নিয়ে আসতেন। সেখান থেকেই মূলত হাজী নূর হোসেন সাহেব এবং হাজী মোহাম্মদ আলী সাহেব গহরপুরী হুযূর-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হন এবং কিছুদিন পর তার মুরীদ ও ভক্তে পরিণত হন।

হাজী সাহেবরা দুজনই হুযূরকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। গহরপুরী হুযূরের যে কোন কথা তারা রাখতেন। একবার গহরপুরী হুযূর স্বপ্নে দেখলেন–সাতমসজিদের পশ্চিম পাশে বহু টুপিওয়ালা মানুষের আনাগোনা। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন যে, এখানে তালিবে ইলমদের পদচারণা হবে। স্বপ্নে দেখা ওই জায়গাটির মালিক ছিলেন দুই ভাই; হাজী মোহাম্মদ আলী ও হাজী নূর হোসেন। গহরপুরী হুযূর তাদেরকে স্বপ্নের কথা জানালেন এবং ব্যাখ্যাও শোনালেন। তারাও প্রিয় মুর্শিদের আবেগের প্রতি সম্মান জানিয়ে জায়গাটি মাদরাসার জন্য ছেড়ে দিতে সম্মত হলেন। এদিকে রাহমানিয়া কর্তৃপক্ষ জামিআ মুহাম্মদিয়া থেকে আসার পর সংকটাপন্ন অবস্থায় মাদরাসা করার জন্য সুবিধাজনক একটি জায়গা খুঁজছিলেন। গহরপুরী হুযূর জানতে পেরে হাজী মোহাম্মদ আলী ও হাজী নূর হোসেন সাহেবকে স্বপ্নে দেখা জায়গাটি মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে দান করে দেয়ার পরামর্শ দিলেন এবং তারাও নিজ পীর ও মুর্শিদের কথা মেনে মাদরাসার জন্য জায়গাটি ওয়াকফ করে দিলেন। অতঃপর গহরপুরী সাহেব মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে উক্ত জায়গায় ভবন নির্মাণের আহ্বান জানালেন। এ প্রসেঙ্গ মুফতী মনসূরুল হক সাহেব বলেন–

"মাদরাসার জমি লাভের পেছনে মূল অবদান গহরপুরী হুযূরের। ভিত্তিপ্রস্তর থেকে শুরু করে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত গহরপুরী হুযূর ছিলেন জামিআ রাহমানিয়ার অন্যতম মুরুব্বী।"

মুহাম্মদিয়া থেকে চলে আসার পর প্রথম দিকে হাজী নূর হোসেন কোম্পানী সাহেবের নিজস্ব নির্মিতব্য দোতলা বিল্ডিংয়ের নিচতলায় রাহমানিয়ার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সেগুলোর জানালা পর্যন্ত তখনও লাগানো হয়নি এবং মেঝের নেটফিনিশিংও সম্পন্ন হয়নি। এ সময় শিক্ষক-ছাত্ররা নানা রকম ত্যাগ স্বীকার করে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করতো। কিছু থাকতো নূর হোসেন সাহেবের নির্মিতব্য বিল্ডিংয়ে, কিছু সাত মসজিদের ভেতরে, কিছু আশপাশের ভাড়া ঘরে আর কিছু কাটাসুরের ছোট্ট এক মক্তবে। প্রথম বছর এভাবেই কেটে যায়। দ্বিতীয় বছর নূর হোসেন সাহেব বিল্ডিংয়ের কাজ কমপ্লিট করবেন বলে তা ছেড়ে

দিতে হয়। এ সময় নূর হোসেন সাহেব শিক্ষক-ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য সাতমসজিদের দক্ষিণপাশ ঘেঁষে দুটি টিনশেড করে দেন। হাজী নূর হোসেন সাহেব এই সব কিছু ফি-সাবীলিল্লাহ করে দিয়েছিলেন; কোন প্রকার বিনিময় বা ভাড়া নেননি। সেই দিনগুলোতে বাসস্থানের তীব্র সংকট ছিল। বর্ষার মৌসুমে সেই কষ্ট বহুগুণ বেড়ে যেতো। রাহমানিয়ার শুরুটা এভাবেই কেটে যায়। পরিচালনা পরিষদের এক অধিবেশন থেকেও বিষয়টি অনুধাবন করা যায়– *"কৃত্রিম বন্যার কারণে জামেয়ার ছাত্রাবাস সংকট সম্পর্কে আলোচনা হয়। এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, লোহার শিট বিছিয়ে আপাতত যেভাবে ক্লাস চালানো হচ্ছে এভাবে বেশী অসুবিধা হয়ে গেলে সাতমসজিদের পূর্ব ও পশ্চিম পাশে ত্রিপল টানিয়ে ছাত্রদের থাকার ও ক্লাস চলার এন্তেজাম করতে হবে।"* (কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশন: অধিবেশন-২৫, ধারা-২, তারিখ: ৩০/৯/১৯৮৯ খ্রি.)

রাহমানিয়ার অভ্যন্তরীণ পর্যায়ক্রমিক যিম্মাদার

'জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া' (সাত মসজিদ মাদরাসা) নামে কার্যক্রম শুরু হয় ১ জুলাই ১৯৮৮ ঈসায়ী তারিখে। মাদরাসা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শুরুতে শুধু মুহতামিম নির্ধারণ করা হয়। আর অন্যান্য যিম্মাদার পূর্ববৎ বহাল থাকে। অর্থাৎ জামিআ মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া নামে পরিচালিত অবস্থায় যারা যেসব যিম্মাদারী পালন করেছেন এখনো তারাই সেসব যিম্মাদারী পালন করতে থাকেন। আলহাজ্ব আব্দুল মালেক সাহেবের সভাপতিত্বে ১লা জুলাই ১৯৮৮ ঈসায়ীর তৃতীয় অধিবেশনে রাহমানিয়ার প্রথম মুহতামিম নির্ধারণ করা হয় জনাব মাওলানা আব্দুল গাফফার সাহেবকে। সেখানে মুহতামিম শব্দটির পরিবর্তে রঈস শব্দ ব্যবহার করা হয়– *"জনাব মাওলানা আব্দুল গাফফার সাহেব-রঈস।"* (কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশন: অধিবেশন-৩, ধারা-৩, তারিখ: ১/৭/১৯৮৮ খ্রি.)

অতঃপর জামিআর প্রশাসনিক কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হবে, যিম্মাদারদের জন্য ব্যবহৃত শব্দ কী হবে সেটা নিয়ে ২৮/৩/৮৯ তারিখে কমিটির ১৬তম অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৬ তম অধিবেশনের বর্ণনাধারা-৪ *"অভ্যন্তরীণ যিম্মাদার নিয়োগ সম্পর্কে চারটি পদ থাকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জিম্মাদারীসমূহ যথাক্রমে ১. রঈসে আমেল। ২. নায়েবে রঈস। ৩. নাযেমে তালীমাত। ৪. নাযেমে তরবিয়ত বা দারুল ইকামা।"*

মাওলানা আব্দুল গাফফার সাহেবের অব্যাহতি এবং মাওলানা আলী আসগর সাহেবকে রঈসে আমেল নিয়োগ:

পহেলা জুলাই ১৯৮৮ ঈসায়ী থেকে জনাব মাওলানা আব্দুল গাফফার সাহেব রাহমানিয়ার রঈসের যিম্মাদারী পালন করে আসছিলেন। তবে যে উদ্দেশ্যে রঈসের যিম্মাদারী প্রদান করা হয়েছিল তা হযরত মাওলানা আব্দুল গাফফার সাহেবের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। হযরতের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল এবং প্রচেষ্টাও ছিল কিন্তু তার দেশব্যাপী ওয়াজ-নসীহত ও অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে তা আর পূরণ হচ্ছিল না। এ কারণে মাত্র এক বছরের মাথায় মাওলানা আব্দুল গাফফার সাহেবকে রঈসে এজাযী নিযুক্ত করা হয় এবং মাওলানা আলী আসগর সাহেবকে রঈসে আমেল বা কার্যকরী মুহতামিম নিযুক্ত করা হয়। ২০ মে ১৯৮৯ ঈসায়ীতে অনুষ্ঠিত ১৮তম অধিবেশনের বর্ণনা ধারা-৫ এর বিবরণ–

"জামেয়ার অভ্যন্তরীণ জিম্মাদার নির্ধারণ সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বিগত বছরে জামেয়ার প্রিন্সিপ্যাল হযরত মাওলানা আব্দুল গাফফার সাহেব সিদ্ধান্ত এবং ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাহার দায়িত্ব কাজে জামেয়ায় উপস্থিত হওয়ার সুযোগ সময় করিতে সক্ষম হন নাই। দীনের ওয়াজ নসীহতে সর্বদাই তাহার ব্যস্ততা অপরিসীম। তাই সম্মানী পদরূপে তাহাকে জামেয়ার প্রিন্সিপ্যাল সাব্যস্ত করা হইল। জামেয়া পরিচালনা পরিষদ তাহাকে এই পদে থাকার অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে। জামেয়ার অভ্যন্তরীণ কার্যবিধি পরিচালনার জন্য শাইখুল জামেয়ার তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত আসাতিযায়ে কেরামকে বিভিন্ন দায়িত্বের জন্য নির্ধারণ করা হইল। তাহারা শিক্ষকতার সাথে অবৈতনিকরূপে এইসব দায়িত্বের খেদমত আঞ্জাম দিয়া যাইবেন।
১. জনাব মাওলানা আলী আজগর সাহেব-রঈসে আমেল।
২. জনাব মাওলানা মনসূরুল হক সাহেব-নায়েবে রঈস।
৩. জনাব মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব-নাযেমে তালীমাত।
৪. জনাব মাওলানা বাহাউদ্দীন সাহেব-নাযেমে দারুল ইকামা।"

মাওলানা আব্দুল গাফফার সাহেবের অব্যাহতি:

এক বছরের মাথায় পরিচালনা পরিষদের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয়– *"জনাব মাওলানা আবদুল গফফার সাহেবের অনারারী (সম্মানী পদ) প্রিন্সিপ্যাল পদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তার কর্মব্যস্ততা ও বাহিরের বিভিন্ন প্রোগ্রামের কারণে যেহেতু তিনি মাদ্রাসার জন্য সময় দিতে অপারগ, কাজেই তাকে অনারারি প্রিন্সিপ্যাল পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল।"* (১৫/৬/১৯৯০ ঈসায়ী তারিখে অনুষ্ঠিত ৩১ তম অধিবেশন, ধারা-৫-খ)

শাইখুল হাদীস রহিমাহুল্লাহকে প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগ (১৯৯২-১৯৯৯):

মাওলানা আলী আসগর সাহেব প্রায় আড়াই বছর মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর উদ্ভূত কিছু কারণে তিনি পদত্যাগ করেন। তারপর শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহিমাহুল্লাহ মুহতামিম নিযুক্ত হন। ১১/০৯/১৯৯২ ঈসায়ী তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৬ তম অধিবেশন, ধারা-৮ এর বিবরণ– *"জনাব প্রিন্সিপ্যাল [জনাব হযরত মাওলানা আলী আসগর] ছাহেবের পদত্যাগপত্র অদ্যকার অধিবেশন অনুমোদন করে এবং তাহাকে উক্ত জিম্মাদারী থেকে অব্যাহতি দান করে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, তাহার স্থানে হযরত শাইখুল জামেয়া [আল্লামা আজিজুল হক] ছাহেব দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন।"*

অতঃপর মাওলানা বাহাউদ্দীন সাহেব ০১/০৮/১৯৯৯ ঈসায়ী থেকে ১৭/১১/১৯৯৯ ঈসায়ী পর্যন্ত প্রায় তিন মাস প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তাকে বিশেষ কারণে অব্যাহতি দেয়া হয়।

এরপর মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবকে অস্থায়ী মুহতামিম নিযুক্ত করা হয়। মুহতামিম নিযুক্ত হওয়ার দুই মাসের মাথায় ২৭/১/২০০০ ঈসায়ী তারিখে কৃতিত্বের সাথে মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করায় সর্বসম্মতভাবে স্থায়ী মুহতামিম বানানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। (অধিবেশন ১০৫, ধারা-৬-খ)

রাহমানিয়ার জমি ও ওয়াকফ দলীল

আল্লামা নূরুদ্দীন গহরপুরী রহিমাহুল্লাহর প্রচেষ্টায় (বিস্তারিত বিবরণ রাহমানিয়ার সূচনা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে) ১২ নভেম্বর ১৯৮৮ ঈসায়ীতে হযরতেরই দুই ভক্ত ও মুরীদ আলহাজ্ব নূর হোসেন সাহেব ও তার বড় ভাই আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী সাহেব ১০ কাঠা সমান ১৬ শতাংশ জমি মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করেন এবং এই ভাতৃদ্বয় প্রায় সম্পূর্ণ নিঃশর্তভাবে মাদরাসা পরিচালনা কমিটিকে জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার জন্য এই জমিতে হস্তক্ষেপের পূর্ণ অধিকার ও ক্ষমতা প্রদান করেন।

ওয়াকফ দলিল নং ৩৭৭১/৮৮-এর বিবরণ–

"অত্র ওয়াকফ লিল্লাহ দলিল সম্পাদন করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে আমরা উভয়ে মুসলমান। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ আমাদের ইহকাল ও পরকালের একান্ত কামনা। ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া মানুষ সম্পূর্ণ নহে। আল্লাহ এবং রাসূল (দ.) এর প্রদর্শিত পথে চলার জন্য ধর্মীয় শিক্ষা অত্যাবশ্যক। তাই আমাদের জীবদ্দশায় ধর্মীয় শিক্ষার জন্য কিছু বন্দোবস্ত করার নিয়তে আইনজ্ঞ এবং হিতৈষীদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া আমাদের পক্ষে এবং বিশ্বের সমস্ত মুসলমান নর এবং নারীদের ইহকাল এবং পরকালের নেকী সাব্যস্ত করিয়া আমাদের সত্ত্ব দখলিয় নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি নিজ অর্থে খরিদ কৃত ভূ-সম্পত্তি মোহাম্মদপুরস্থ জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ মাদ্রাসার বরাবরে আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াকফ করিতেছি। অদ্য হইতে উল্লিখিত মাদরাসাকে উক্ত সম্পত্তির সত্ত্ববান করিয়া আমরা উহা হইতে চিরতরে নিঃস্বত্ত্ববান হইলাম। উক্ত সম্পত্তি নির্দায় ও নিষ্কন্টক অবস্থায় ওয়াকফ করিয়া দিলাম। এই সম্পত্তি মাদ্রাসার কমিটি পরিচালনা করিবেন।

মাদরাসা কমিটি আমাদের নামের স্থলে রাজস্ব অফিসে নামজারি করিয়া খাজনাদি পরিশোধ করিবেন এবং উহা মাদ্রাসার কাজে যদিচ্ছা ভোগ দখল ব্যবহার করিবেন। আমাদের বা আমাদের ওয়ারিশগণের ওজর-আপত্তি চলিবে না। করিলেও তাহা সর্ব আদালতে অগ্রাহ্য হইবে। আমাদের ইচ্ছা, মাদ্রসার কমিটি বৎসরে একবার মাহফিলের ব্যবস্থা করিবেন। এবং বিশ্ব মুসলিমদের তরকিক [তরক্কি] এবং তাহাদের ইহকাল ও পরকালের সুখ শান্তির জন্য আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করিবেন। আমরা সুস্থির, সাংসারিক এবং বিষয় সমস্ত সম্বন্ধে আমাদের সম্যক জ্ঞান আছে। এতদ্বার্থে সজ্ঞানে হাজিরান মজলিসে তফসীল বর্ণিত সম্পত্তি ওয়াকফ লিল্লাহ করিয়া ঘোষণা দিয়া অত্র দানপত্র দলিল সম্পাদন করিলাম।"

পরবর্তীকালে ওয়াকিফগণ ২৬/০৭/২০০৩ তারিখে নোটারী পাবলিক হলফনামায় দাবি করেন যে, *"দলিলে যদিও মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটি ওয়াকফ সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী হইবেন বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে তবুও ওয়াকফ সম্পত্তিটি কিভাবে পরিচালিত হইবে তাহার বিশদ বিবরণ প্রদান করা হয় নাই বিধায় আমরা ওয়াকিফগণ অত্র হলফনামা সম্পাদন করিয়া ওয়াকফ সম্পত্তির পরিচালনা শর্তাদি বিশদভাবে বর্ণনা করিতেছি যাহা মূল দলিলের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।"*

৬/১/১৯৯২ সনে [মেইনরোডের পাশে আলী-নূর ভ্রাতৃদ্বয়ের মালিকানাধীন ৫ কাঠার এওয়াজে] আলহাজ্ব জনাব ছাবেদ আলী মোল্লা সাহেব ৫ কাঠা এবং আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী সাহেব ও জনাব নূর হোসেন সাহেবদের নিজস্ব ১ কাঠাসহ মোট ৬ কাঠা জমি জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার জন্য ওয়াকফ করেন এবং এই ওয়াকফ দলিলেও পূর্বের ন্যায় মাদরাসা পরিচালনা কমিটিকে উক্ত জমি ভোগ দখল ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদান করেন।

আলহামদুলিল্লাহ! তারপর থেকেই উক্ত জমিতে ছাত্রদের তালীম-তরবিয়ত ও জনমানুষের দীনী চাহিদা পূরণে যাবতীয় দীনি খেদমত অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালিত হতে থাকে এবং ওয়াকিফগণ যে ইচ্ছা ও শর্ত অনুসারে জমি ওয়াকফ করে ছিলেন এবং যেভাবে গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়েছিল সম্পূর্ণ সে আলোকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিবেদিতপ্রাণ কমিটি ও আসাতিযায়ে কেরাম পূর্ণ ইখলাছ, নিরলস মুজাহাদা ও জনমানুষের দুআ ও প্রচেষ্টায় রাহমানিয়া একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অতঃপর একসময় নির্মিত হয় সাত মসজিদের কোলঘেঁষে প্রায় ষোল কাঠা জমির উপর দৃষ্টিনন্দন পাঁচতলা ভবন।

রাহমানিয়া ভবন নির্মাণ

জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার পরিচালনা পরিষদ দ্বিতীয় অধিবেশন থেকেই রাহমানিয়ার জন্য নিজস্ব জমি সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, ক্রয় অথবা ওয়াকফ যেভাবেই সম্ভব হয় জমিটি সংগ্রহ করা হোক। সে হিসেবে মাদরাসা বিল্ডিং-এর খসড়া প্রণয়নের জন্য তারা চেষ্টা করছিলেন। তারপর ২০/১০/১৯৮৮ এর ৬ নং অধিবেশনে মাদরাসা বিল্ডিং-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়। পাশাপাশি বিল্ডিংয়ের পিলারসমূহ কোন অবস্থানে কতটুকু জায়গায় স্থাপিত হবে সেটাও সিদ্ধান্ত হয়।

তারপর অল্পদিনের ব্যবধানে ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৮, রোজ শুক্রবার জামিআর কমিটি, আসাতিযায়ে কেরাম, মহল্লাবাসী ও আশপাশের শুভানুধ্যায়ী ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন জলসার মাধমে উদ্বোধন হয় জামিআর ভবন নির্মাণের কাজ এবং কয়েক বছরের মধ্যেই ভবনের প্রথমাংশের কাজ সমাপ্ত হয়।

তারপর ১৩-১০-১৯৯৩ ঈসায়ীতে শুরু হয় বর্ধিত অংশের নির্মাণ কাজ। নতুন বর্ধিত অংশের নির্মাণ কাজ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। সর্বশেষ ২১/৯/১৯৯৯ ঈসায়ীতে জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার পূর্ণ ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। নির্মাণ কাজে আর্থিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল মালেক সাহেব, আলহাজ্ব নূর হোসেন কোম্পানী সাহেব ও আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী সাহেব, জনাব সেক্রেটারী আহমদ ফজলুর রহমান সাহেব প্রমুখ মহোদয়গণের অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

রহমানিয়া ভবনের নতুন-পুরাতন উভয় অংশ নির্মাণের ক্ষেত্রে মুফতী মনসুরুল হক সাহেব-এর শারীরিক-মানসিক এবং রক্ত পানি করা শ্রম বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। শুরু থেকেই তিনি রাহমানিয়া ভবন নির্মাণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। ডিজাইন নকশা প্রণয়নে সহযোগিতা, শ্রমিকদের নিত্যদিনের মজুরী প্রদান, মালসামানা ও আসবাবপত্র ক্রয়, পাওনা পরিশোধ, কখনো কখনো ছাত্রদের মাধ্যমেও নির্মাণ কাজে সহযোগিতা গ্রহণসহ যাবতীয় কার্যক্রমে পরিপূর্ণ শ্রম ব্যয় করেছেন। একবার তিনি বিদেশ সফরে একটি প্রতিষ্ঠানের ডিজাইন দেখে আকৃষ্ট হয়ে যান। মনে মনে স্বপ্ন বুনেন আল্লাহ তাআলা কখনো প্রতিষ্ঠান গড়ার সামর্থ্য দিলে এই ডিজাইনে গড়ে তুলবো। তারপর বহু বছর পেরিয়ে যখন রাহমানিয়া গড়ার তাওফীক হলো তখন বহু আগে দেখে আসা সেই আদলেই গড়ে তোলেন রাহমানিয়ার সম্মুখকাঠামো।

রাহমানিয়ার কমিটি গঠন ও চলমান কমিটি

পহেলা জুলাই ১৯৮৮ ঈসায়ী । আলহাজ্ব আব্দুল মালেক সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মোহাম্মাদিয়ার পূর্ব স্থান ছেড়ে আসার পর তৃতীয় অধিবেশন। জামিআ মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া নামেই সিরাজুদ্দৌলা সাহেব চুক্তি বিপরীত নিজ বাসায় মক্তব থেকে দাওরা পর্যন্ত যথারীতি মাদরাসা কার্যক্রম শুরুর ঘোষণা দিয়ে দেন। এবং প্রচারপত্র বিতরণ করেন। একই নামে যেহেতু দুটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হওয়া অসম্ভব এবং নিয়মবহির্ভূত। তাই অদ্যকার বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখন থেকে জামিআর নতুন নাম হবে জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া। এবং এটাও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জামিআর রশিদপত্রসহ যেসব কাগজাদি পূর্বের নামে ছাপানো

রহিয়াছে সেগুলোতে নতুন নামের স্ট্যাম্প লাগাইয়া ব্যবহার করা হইবে।

যেহেতু জামিআর নতুন নাম অনুমোদিত হয়ে যায় তাই স্বাভাবিকভাবেই পূর্ববর্তী কমিটি বিলুপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ নতুনভাবে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মতে প্রস্তাব গৃহীত হয়–

১. জনাব হাজী আব্দুল মালেক-সভাপতি। ২. জনাব হাজী আব্দুল মতীন সাহেব-সহ-সভাপতি। ৩. জনাব মাওলানা ইসহাক সাহেব-সহ সভাপতি (তিনি খেলাফত মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম আমীর। খেলাফত মজলিস প্রতিষ্ঠিত হয় ৮ডিসেম্বর ১৯৮৯ ঈসায়ী।) ৪. জনাব হাফেজ মোজাম্মেল হক সাহেব-সাধারণ সম্পাদক। ৫. জনাব হাজী আহমদ ফজলুর রহমান সাহেব-কোষাধ্যক্ষ। ৬. জনাব মাওলানা আব্দুল গাফফার সাহেব-রঈস। পরিচালনা পরিষদের অন্যান্য সদস্য নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হইল।

ক. জনাব মাওলানা আজিজুল হক সাহেব, আহবায়ক। খ. জনাব মাওলানা আব্দুল গাফফার সাহেব। গ. জনাব হাজী আব্দুল মালেক সাহেব। ঘ. জনাব হাফেজ মোজাম্মেল হক সাহেব। ঙ. জনাব মোঃ ফজলুর রহমান সাহেব। চ. জনাব মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ সাহেব। ছ. জনাব অধ্যাপক হামিদুর রহমান সাহেব।

৭/৭/১৯৮৮ ঈসায়ী তারিখে অপূর্ণাঙ্গ কমিটি পূর্ণাঙ্গকরণ এবং কমিটির অন্যান্য সদস্য নির্বাচনের জন্য শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত ধারা ক-এর বিবরণ অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্যাদি এই–

"বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে তাহাদের সম্মতিক্রমে জামেআর নতুন কমিটির সদস্য নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১. জনাব মাওলানা আজিজুল হক
২. জনাব প্রফেসর হামিদুর রহমান
৩. জনাব মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ
৪. জনাব মাওলানা আব্দুল মালেক
৫. জনাব মাওলানা আব্দুল কাদের
৬. জনাব মাওলানা আব্দুর রউফ
৭. মোহাম্মদ নূর হোসেন
৮. জনাব মাওলানা আলী আসগর
৯. জনাব হাজী সুলাইমান।

অধিবেশনে আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, পরিচালনা পরিষদের মূল সদস্য ২১ জন হইবে। আরো কিছু ব্যক্তিবর্গকে এজাজী সদস্য হিসেবে পরিচালনা পরিষদের সদস্য করা হইবে তাদের উপর কোরাম নির্ভর করিবে না। অবশ্য তাহারা উপস্থিত হইলে ভোটাধিকার লাভ করিবেন।"

তারপরই আলহামদুলিল্লাহ ১৪ জুলাই ১৯৮৮ ঈসায়ী, রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ ঘটিকায় জামিআ দপ্তরে জনাব আলহাজ্ব আব্দুল মালেক সাহেবের সভাপতিত্বে জামিআর নবগঠিত পরিচালনা পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আর শুরু হয় নিবেদিতপ্রাণ একদল মুখলেস, নির্লোভ, মহৎপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের জামিআর ভিত ও প্রশাসনিক অবকাঠামো গঠনের এক নিরলস প্রচেষ্টা ও সক্রিয় তৎপরতা।

প্রকৃত অর্থেই উপরোক্ত গুণাবলী প্রয়োগ রাহমানিয়ার এই কমিটির মহোদয়গণের জন্য যথার্থ প্রয়োগ। তারা প্রত্যেকেই ছিলেন উন্নত রুচি ও অনন্য চিন্তাশীল, উচ্চ শিক্ষিত এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। সামাজিক অবস্থানেও প্রায় সকলেই ছিলেন সর্বজনমান্যবর ও প্রভাবশালী সজ্জন ব্যক্তি। শাইখুল হাদীস রহিমাহুল্লাহ জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার এই কমিটি মহোদয়গণের ব্যাপারে প্রায়ই বলতেন– "আমার কমিটির মতো ভালো কমিটি বাংলাদেশের কোথাও নেই।

বিশেষত এই কমিটির প্রতিষ্ঠাকালীন সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল মালেক সাহেব; তাঁর ব্যাপারে শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলতেন, আমার ধারণা ছিল মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক হওয়ার জন্য আলেম হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু হাজী আব্দুল মালেক সাহেবকে দেখে আমার সে ধারণা পাল্টে গেছে।

তারপর পর্যায়ক্রমে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর কমিটি নবায়ন হতে থাকে। কারও মৃত্যুবরণ কিংবা গঠনতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত হওয়া ব্যতীত নতুন কোন সদস্য সংযোজন-বিয়োজন হয়নি। সে হিসেবে ২৬-৬-১৯৯৯ ঈসায়ীর ৮৮তম অধিবেশনে পেশকৃত রাহমানিয়ার পরিচালনা পরিষদের সদস্য তালিকা ছিল নিম্নরূপ। তার মধ্যে স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মধ্যে তেমন কোনোই পরিবর্তন হয়নি। বরং প্রতিষ্ঠাকাল থেকে যারা দায়িত্বশীল ছিলেন এখনো পর্যন্ত তারাই দায়িত্বশীল আছেন।

হাজী আব্দুল মালেক-সভাপতি
হাজী আব্দুল মতীন-সহ সভাপতি
মাওলানা আজিজুল হক-শাইখ
(৭-৭-১৯৮৮ ঈসায়ীর এক বিশেষ অধিবেশনে রাহমানিয়ার নবগঠিত প্রথম কমিটিতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হন এবং অদ্যাবধি যুক্ত আছেন।)
হাজী আহমদ ফজলুর রহমান-সম্পাদক
হাজী শহীদুল্লাহ-অর্থ সম্পাদক
(সদস্য)
হাজী মোহাম্মদ আলী
হাজী নুর হোসাইন
মাওলানা আব্দুল মালেক
কারী মোজাফফর হোসেন
মুফতী মনসূরুল হক (শুরু থেকেই তিনি এজাজী সদস্য হিসেবে পরিচালনা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারপর ২১-১১-১৯৯২ তারিখ থেকে (অফিসিয়ালি) অদ্যাবধি কমিটিতে যুক্ত আছেন।
মাওলানা হিফজুর রহমান
(১৯-১১-১৯৯৩ ঈসায়ীতে প্রথম পরিচালনা পরিষদে সদস্য হিসেবে যুক্ত হয়ে এখন পর্যন্ত আছেন)
প্রফেসর হামীদুর রহমান (রাহমানিয়ার সূচনাকাল থেকে অদ্যাবধি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত আছেন।)
হাজী আহমদ হোসাইন
হাজী বাদশা খান
হাফেজ এনায়েতুল্লাহ
হজী দীন মোহাম্মদ
শাহ মুহাম্মদ নূরুল গণী
এয়ার কমোডর (অব.) কামালুদ্দীন আহমদ
হাফেজ আব্দুল গাফফার
হাজী রবিউল্লাহ।

তারপর ২ সেপ্টেম্বর ২০০০ ঈসায়ীতে ১০৩ তম অধিবেশনে আলহাজ্ব আব্দুল মালেক সাহেবের সভাপতিত্বে পরিচালনা কমিটির দুটি সদস্য পদ খালি হওয়ায় শূন্যপদ পূরণে নতুন দুজন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শূন্যপদে যেহেতু দুজন আলেম সদস্য ছিলেন তাই তাদের স্থলে দুজন আলেম সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২/৯/২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০৩ নং অধিবেশনের ধারা ৬: ক-এর বিবরণ– "*মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব (বছিলা)-কে জামিআর স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়ার*

অদ্য এ মজলিসে তার সদস্যপদ বাতিল করা হয়। জামিআর পরিচালনা কমিটির মধ্যে দুটি সদস্য পদ খালি আছে। এ ব্যাপারে আলহাজ্ব শাহ মোহাম্মদ নুরুল গনি সাহেব প্রস্তাব পেশ করেন উক্ত পদে যেহেতু দুজন আলেম সদস্য ছিলেন সুতরাং তাদের স্থলে আলেম সদস্য নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেমতে তিনি নূরানী ওয়াকফ এস্টেট এর প্রবীণ শিক্ষক জনাব মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব এবং জনাব মুফতী মিজানুর রহমান সাহেব ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা এর নাম প্রস্তাব করেন। সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তাহাদের উভয়কে জামিআর পরিচালনা কমিটির সদস্য মনোনীত করা হয়।"

সে মতে ১-৫-২০০১ ঈসায়ীতে ১০৬ তম অধিবেশনে প্রকাশিত পরিচালনা পরিষদের সদস্য তালিকা হলো–

হাজী আব্দুল মালেক-সভাপতি
হাজী আব্দুল মতিন–সহ সভাপতি
হাজী আহমদ ফজলুর রহমান-সম্পাদক
হাজী শহীদুল্লাহ-অর্থ সম্পাদক
(সদস্য)
হাজী মোহাম্মদ আলী
হাজী নুর হোসাইন
কারী মোজাফফর হোসেন
মুফতী মনসূরুল হক
মাওলানা হিফজুর রহমান
প্রফেসর হামীদুর রহমান
হাজী আহমদ হোসাইন
হাজী বাদশা খান
হাফেজ এনায়েতুল্লাহ
হাজী দীন মোহাম্মদ
শাহ মুহাম্মদ নুরুল গণী
এয়ার কমোডর (অব.) কামালুদ্দীন আহমদ
হাফেজ আব্দুল গাফফার
হাজী রবিউল্লাহ
হাজী আব্দুল বারী
মাওলানা রহমতুল্লাহ
মুফতী মিজানুর রহমান

বি.দ্র. শাইখুল হাদীস আজিজুল হক সাহেব ইতিপূর্বে রাহমানিয়া থেকে অব্যাহতির দরুন চলে গিয়েছেন। আর অন্যান্য সকল সদস্য পূর্ববৎ বহাল রয়েছেন এবং এখনো পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাকালীন সেই কমিটিই রাহমানিয়া পরিচালনা করছেন। কোন একজন সদস্যও কখনো রাহমানিয়ার গঠনতন্ত্রটির বাইরে মূল পরিচালনা পরিষদের বিপরীতে অবস্থান নেননি। তবে ৩/১১/২০০১ তারিখে রাহমানিয়া ভবন জবরদখলের পর ৪/১১/২০০১ তারিখে দখলদারগণ শাইখুল হাদীস সাহেব এবং অত্র পরিচালনা পরিষদ হতে সদস্যপদ বাতিল হওয়া মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব (বছিলা)-কে আহ্বায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেছে, যাদের মধ্যে রাহমানিয়ার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যগণের কেউ ছিল না।

মতবিরোধের সূত্রপাত। কারণসমূহ। ছাত্রদেরকে রাজনীতিতে জড়ানো। সর্বম্মত কানুন বাতিলের প্রচেষ্টা। কমিটি বাতিলের উদ্যোগ। কমিটির পদক্ষেপ। রাত্রিকালীন ব্যর্থ ছাত্রঅভ্যুত্থান। সাময়িক অব্যাহতি। মজলিসে শূরার প্রচেষ্টা। চূড়ান্ত অব্যাহতি। জবরদখল। সহিংসতা

মতবিরোধের সূত্রপাত, প্রধানতম কারণ ও তার ব্যাখ্যা

অনুসন্ধানে দ্বিপাক্ষিক এ মতবিরোধের কয়েকটি কারণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রধানতম কারণ হল–

ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে শাইখ রহিমাহুল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ।

মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ কয়েকটি বিষয় জেনে নেয়া যাক–

এক: সিয়াসাত তথা রাজনীতি ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। আবার ইলমে দীনের হেফাজত তথা সংরক্ষণও এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার বিকল্প নেই। সাধারণভাবে রাজনৈতিক মেহনতের পাত্র হল জনসাধারণ। আর ইলমী মেহনতের পাত্র হল তালেবে ইলম বা ছাত্রগণ। রাজনৈতিক মেহনতের দাবী হল, মাঠে-ময়দানে দৌড়-ঝাঁপ করে এবং প্রয়োজনে জেল-জুলুম সহ্য করে সাফল্য অর্জন করা। আর ইলমে দীনের মেহনতের দাবী হল, নির্দিষ্ট স্থানে জমে-বসে একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে তা আঞ্জাম দেয়া। এই দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্যের দু'টি দীনী দায়িত্ব আমাদের দীনী মুরুব্বীগণ বহুকাল ধরেই ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পালন করে এসেছেন; অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া তারা একটাকে অপরটার সঙ্গে একীভূত করেননি। সুতরাং কোন বিজ্ঞ আলেমে দীন যদি ইলম ও রাজনীতি উভয় দায়িত্ব পালনে যোগ্য হন তাহলে তিনি মাঠে-ময়দানে জনসাধারণকে নিয়ে ইসলামী রাজনীতির খেদমত আঞ্জাম দিবেন আর প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে তালিবে ইলমদের মধ্যে শুধু ইলম বিতরণের খিদমত করবেন; তালিবে ইলমদেরকে কোন সাংগঠনিক কার্যক্রমে জড়াবেন না। হ্যাঁ, প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা সমাপন করার পর কোন আলেমের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক যোগ্যতা অর্জিত হলে এবং সে-ও আগ্রহী হলে তার জন্য সম্পূর্ণরূপে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে জড়ানোতে কোন অসুবিধা নেই। বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম বর্তমানের নাযুক সময়ে এটাকেই সঠিক ও নিরাপদ পন্থা বলে বিবেচনা করেছেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহিমাহুল্লাহ, শাইখুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলবী রহিমাহুল্লাহসহ প্রায় শতভাগ আকাবিরে দেওবন্দেরই এই অভিমত।

দুই: জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার মুরুব্বীগণ ছাত্রদের তালীম-তরবিয়ত তথা শিক্ষা-দীক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং এ ব্যাপারে তারা একেবারেই আপোষহীন ছিলেন ও আছেন। তালীম-তরবিয়তে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এমন সকল কার্যক্রমে– চাই তা অন্য দৃষ্টিকোন থেকে যতই উপকারী হোক– তারা কিছুতেই ছাড় দেন না। একটি নমুনা দেখুন–

"০৪. (খ) *তাছাড়া আসাতিযা কেরামদের ইমামতির ব্যাপারে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, যে সমস্ত উস্তাদগণ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মাদরাসায় অবস্থান করে মুহাম্মদপুর এলাকায় ইমামতি করছেন, তাদেরকে ছয় মাস পর্যন্ত দেখা হবে। যদি তাদের ইমামতির কারণে মাদরাসার তালীম-তরবিয়তে কোন অসুবিধা না হয়, তাহলে বহাল রাখা হবে, নচেৎ নিষেধ করা হবে।*" (কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশন: অধিবেশন–৯১, পৃষ্ঠা নং ৬০। উল্লেখ্য এই অধিবেশনে শাইখের দস্তখত রয়েছে।)

তিন: জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার পরিচালনা কমিটি ও শিক্ষকবৃন্দ মাদরাসাটির প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ছাত্রদের জন্য ক্ষতিকর বিধায় যে কোন ধরণের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রমে ছাত্রদের যুক্ত হওয়াকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং এই আইন অমান্য করাকে বহিষ্কারযোগ্য অপরাধ বিবেচনা করেন। ছাত্রদের ভর্তি ফরমে এবং পরিচালনা কমিটির বিভিন্ন অধিবেশনে ছাত্র-রাজনীতি নিষিদ্ধের এই কানুন লিপিবদ্ধ রয়েছে। এমনকি ২০০১ সালে জামিআ রাহমানিয়া যখন বেদখল হয়ে যায়, তখন দখলদাররাও তাদের ছাত্র-ভর্তি ফরমে "ভর্তিচ্ছু ছাত্রের অঙ্গীকার" শিরোনামের ৮ নং ধারায়– "*জামিআয় শিক্ষাকালে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন রাজনৈতিক দল বা ছাত্র সংগঠনের সহিত কোনভাবে জড়িত হইব না। জামিআর অভ্যন্তরেও কোন দলাদলি করিব না। অন্যথায় বহিষ্কারাদেশসহ যে কোন শাস্তি মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিব।*"– শব্দাবলীর মাধ্যমে সামান্য পরিবর্তনসহ কানুনটি বহাল রেখেছে। (চিত্র: পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬)।

চার: জামিআ রাহমানিয়ার সূতিকাগার জামিআ মুহাম্মদিয়া আরাবিয়া থেকে অদ্যাবধি এই কানুন অতীব গুরুত্ব সহকারে কার্যকর হয়ে আসছে। এমনকি শাইখ রহিমাহুল্লাহর উপস্থিতিতে এবং তার অনুমোদনেও বহুবার এই কানুন কার্যকর হয়েছে। উদাহরণত মাওলানা মুনীর খুলনাবী, মাওলানা হেমায়েতুল্লাহ, মাওলানা মামুনুল হক প্রমুখকে "ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ" কানুন ভঙ্গের অপরাধে স্বয়ং শাইখ রহিমাহুল্লাহর উপস্থিতি ও অনুমোদনক্রমে বহিষ্কার করা হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, জামিআ রাহমানিয়ার প্রতিষ্ঠাতাগণ নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে মাদরাসার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তালীম-তরবিয়তের জন্য ক্ষতিকর বিধায় ছাত্রদের জন্য কোন প্রকার রাজনৈতিক সংগঠনে যোগদান এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। (উল্লেখ্য এই কানুন দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল, সিয়াসাত ও রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ বা প্র্যাকটিক্যাল চর্চা নিষিদ্ধ হওয়া; কিতাবপত্রের মাধ্যমে ইসলামী রাজনীতি ও তার কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন কখনও নিষিদ্ধ ছিল না এবং এটি নিষিদ্ধ করার বিষয়ই নয়।) উদাহরণ হিসেবে রাহমানিয়ার কমিটির মিটিংয়ের ৯১তম অধিবেশনের অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো। এই অধিবেশনে স্বয়ং শাইখুল হাদীস রহিমাহুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর স্বাক্ষরও রয়েছে–

"০২. *সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, রাজনীতি ছাত্র ও মাদরাসার জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় জামিআ রাহমানিয়ার ছাত্রদের জন্য রাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং ছাত্রগণ কোনরূপ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যথা মিটিং, মিছিল, বিক্ষোভ মিছিল, রোডমার্চ ও সরকারবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না। অবশ্য দীনের বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দিলে রাজনীতি হিসাবে নয় বরং দীনী দায়িত্ব পালন হিসাবে পরিচালনা পরিষদের অনুমতিক্রমে যাইতে পারিবে।*" (কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশন: অধিবেশন–৯১, পৃষ্ঠা নং ৫৯-৬০)

অতঃপর ৯২ নং অধিবেশনে উল্লিখিত ৯১ নং রেজুলেশনের কিছু অংশে সংশোধনী আনা হয়। যার বিবরণ নিম্নরূপ–

"গত মিটিংএর সিদ্ধান্তসমূহ পঠিত হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে উহা অনুমোদিত হয়। অবশ্য ০২ নং সিদ্ধান্তের শেষাংশ এর ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করা হয়। এবং অদ্যকার মিটিং-এ প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ইসলামী বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দিলে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য পরিচালনা কমিটির স্থলে সাবকমিটিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সাবকমিটির সদস্য থাকবেন জনাব সভাপতি ছাহেব, সেক্রেটারী ছাহেব, মাওঃ আব্দুল মালেক ছাহেব, কারী মুজাফফর হোসেন ছাহেব এবং মজলিসে আসাতিযার সদস্য আসাতিযা কেরামগণ।" (কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশনঃ অধিবেশন-৯২, পৃষ্ঠা নং ৬২। উল্লেখ্য, এই অধিবেশনেও শাইখুল হাদীস রহিমাহুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন এবং তার স্বাক্ষরও রয়েছে।)

তবে উল্লিখিত কানুন দ্বারা শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহিমাহুল্লাহর রাজনৈতিক খেদমতকে কখনই খাটো করে দেখা হয়নি এবং রাহমানিয়ার শাইখ ও মুরুব্বী হওয়া সত্ত্বেও শাইখের জন্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কোনকালেই নিষিদ্ধ ছিল না। কমিটির যে মিটিংয়ে বিশেষ প্রেক্ষাপটে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের বিষয়টি নবায়ন করা হয়েছিল সেই ৯১তম অধিবেশনের নিম্নলিখিত অংশটি দেখুন–

"০৪. (ক) শিক্ষকদের রাজনীতি ও বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদানের ব্যাপারে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, হযরত শাইখুল হাদীছ মাওঃ আজিজুল হক ছাহেব (দাঃ বাঃ) ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষকের জন্য এসব কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।" (কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশনঃ অধিবেশন-৯১, পৃষ্ঠা নং ৬০। উল্লেখ্য, এই অধিবেশনে স্বয়ং শাইখ উপস্থিত ছিলেন এবং শাইখের দস্তখতও রয়েছে।)

অতঃপর ৯২ নং অধিবেশনে উল্লিখিত রেজুলেশনের কিছু অংশে সংশোধনী আনা হয়। যার বিবরণ নিম্নরূপ–

"তাছাড়া ০৪ নং এর (ক) এর ব্যাপারেও প্রস্তাব গৃহিত হয় যে, জামিআর আসাতিযা কেরামের বাতিল প্রতিরোধের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে উক্ত সাবকমিটি সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পেশ করবেন। সেটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিবেচিত হবে।"

(কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশনঃ অধিবেশন-৯২, পৃষ্ঠা নং ৬২। উল্লেখ্য, এই অধিবেশনে স্বয়ং শাইখ উপস্থিত ছিলেন এবং শাইখের দস্তখতও রয়েছে।)

বহু বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত ও প্রয়োগকৃত সর্বসম্মত কানুন– "ছাত্ররা সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না" ভঙ্গ করে ছাত্রদেরকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করানোর প্রমাণ

এ প্রসঙ্গে জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার অফিসিয়াল প্যাডে ১০/০১/২০০০ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুতকৃত একটি প্রতিবেদন অবিকল (শুধু কয়েকটি বানান শুদ্ধ করে) পেশ করা হচ্ছে। এই প্রতিবেদনে উল্লিখিত কানুন ভঙ্গের বিষয়টি বিশদভাবে উল্লিখিত রয়েছে–

"বিসমিহী তাআলা

ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ কানুন বাতিল প্রচেষ্টার প্রতিবেদন

জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার প্রতিষ্ঠার সময় থেকে সর্বসম্মত কানুন ছিল যে, ছাত্রদের জন্য কোন প্রকার সংগঠন, দলগঠন, রাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এবং এ কানুন জামিআর ছাত্র দাখেলা ফরমের [ভর্তি ফরম] অঙ্গীকারনামায়ও লেখা আছে। এবং অনেকবার এ কানুনের ভিত্তিতে জনাব হযরত শাইখুল হাদীস মাওঃ আজিজুল হক ছাহেব-সহ আসাতিযাগণ কর্তৃক অভিযুক্ত ছাত্রদেরকে জামিআ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর শাইখুল হাদীস ছাঃ যখন ইসলামী ঐক্যজোটকে নিয়ে সরকারবিরোধী জোটের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন তখন তিনি ঘন ঘন হরতাল, মিটিং মিছিল ও রোডমার্চে ব্যাপকভাবে ছাত্রদেরকে রাজনীতিতে ব্যবহার করেন। এর প্রেক্ষিতে পরিচালনা কমিটির ০১/০৮/৯৯ ইং অধিবেশনে শাইখুল হাদীস ছাহেবের সমর্থনে জামিআর জন্য ছাত্র রাজনীতি ক্ষতিকর হওয়ার ব্যাপারে নতুনভাবে রেজুলেশন পাশ হয়। এবং ১৯/১০/৯৯ ইং এর অধিবেশনে শাইখুল হাদীস সাহেবের উপস্থিতি ও সমর্থনে এ ব্যাপারে কঠোর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং ছাত্র-শিক্ষদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ শক্তভাবে নিষেধ করে রেজুলেশন পাশ হয়।

দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য যে, জনাব শাইখুল হাদীস ছাহেব উভয় রেজুলেশন মেনে নেওয়ার পরও উহা ভংগ করেন। যেমন ০১/০৮/৯৯ ইং এর অধিবেশনের পর তিনি লন্ডন সফরে যান। ঐ সময় ছয় জন ছাত্র রাজনীতিতে হাতেনাতে ধরা পড়ায় জামিআর সিনিয়র উস্তাদগণ সভাপতি ছাহেবের অনুমোদনক্রমে তাদেরকে বহিষ্কার করেন। এ খবর শাইখুল হাদীস ছাহেবকে তার লোকেরা ফোনে জানান এবং মজলিশ অফিসে উক্ত ছাত্রদের রাখেন। তারপর শাইখুল হাদীস ছাহেব সফর থেকে ফিরে এসে সিনিয়র শিক্ষদের সাথে আলোচনা ছাড়া এবং পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়াই তাদেরকে জামিআতে ঢুকিয়ে দেন। এবং এখন থেকে এ কানুন বাতিল করার অভিমত ব্যক্ত করেন এবং বাকায়দা [নিয়মতান্ত্রিক] ছাত্রসংগঠন করার পক্ষে রায় প্রকাশ করেন।

তারপরে ১৯/১০/৯৯ ইং রেজুলেশন মেনে নেয়ার পর ছাত্র-শিক্ষদের একাধিক মজলিসে উক্ত কানুনটি বাতিল করার চেষ্টা চালান। যেমন রেজুলেশন পাশ হওয়ার পরের দিন ২০/১০/৯৯ ইং মোতাবেক ৯ই রজব ১৪২০ হিঃ দাওরায়ে হাদীছের দরছে এবং ২৩/১০/৯৯ ইং মুতাবেক ১২ রজব দাওরার দরছে মোট দুই দিন এ কানুনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন এবং মাওঃ রুহুল আমীন ছাহেব তার কাফিয়া জামাতের তরজমায়ে কুরআন খতমের মজলিশে শাইখুল হাদীস ছাহেবকে নিয়ে যান এবং তখন শরহেজামী ও শরহে বেকায়ার ছাত্রদেরকেও জমা করা হয়। সে মজলিশে মাওঃ রুহুল আমীন বলেন, ছাত্ররাজনীতি নিষেধ, কমিটির এ সিদ্ধান্ত ছাত্রগণ মানতে রাজি না। তখন শাইখুল হাদীস ছাহেব বলেন, আমি তো কিছু করতে পারছি না। তোমরা কমিটির বিরুদ্ধে খতমে ইউনুস পড়ো।

উস্তাদদের সাপ্তাহিক মিটিং-এ ২৫/১০/৯৯ ইং মুতাবিক ১৪ রজব "২০ হিঃ তিনি উস্তাদদেরকে ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে খোলাখুলি মতামত ব্যক্ত করতে বলেন এবং বলেন যে, আপনাদের মতামত নিয়ে আমি কমিটির সাথে লড়াই করব। এর প্রেক্ষিতে মাওঃ আশরাফ আলী ছাহেব, মাওঃ আশরাফুজ্জামান ছাহেব এবং মাওঃ হাসান আহমাদ গং ছাত্র রাজনীতির পক্ষে বক্তব্য দেন এবং এ ব্যাপারে কমিটির আইন পাশ করার কোন অধিকার নাই মর্মে উল্লেখ করেন। তখন শাইখুল হাদীস ছাহেবও কমিটির এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাআজ্জুব [বিস্ময়] প্রকাশ করতে থাকেন এবং বলেন, সামনের সাপ্তাহিক মিটিং-এ আপনারা এ ব্যাপারে মনখুলে বক্তব্য পেশ করবেন। আমি তা কমিটির মিটিং-এ উঠিয়ে তাদের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে চেষ্টা করব। তদানীন্তন মুহতামিম মাওঃ বাহাউদ্দীন ছাহেব কমিটির নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও কমিটির উক্ত সিদ্ধান্ত ছাত্রদেরকে শুনান নাই এবং তার সহকারী কোন কোন উস্তাদ কমিটিকে ঘাদানিক আখ্যায়িত করেন। অপরদিকে শাইখুল হাদীস ছাহেবের এসব আচরণে অধিকাংশ ছাত্র কমিটির বিরুদ্ধে আন্দোলন মুখর হয়ে ওঠে এবং যে কোন সময় বিস্ফোরণের আশংকা দেখা দেয়। তখন সভাপতি ছাহেব এ খবর জানতে পেরে ২৮/১০/৯৯ ইং মুতাবিক ১৭ রজব ১৪২০হিঃ জনাব মাওঃ হিফজুর রহমান ছাহেবকে অন্য উস্তাদদের

নিয়ে কমিটির মূল সিদ্ধান্ত ছাত্রদের শুনিয়ে দিতে বলেন, যাতে করে সকল ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটে। তার পরে ০১/১১/৯৯ ইং মুতাবিক ২১ রজব ২০খ্রি এর সাপ্তাহিক মিটিং-এর শুরুতে ছাত্র রাজনীতি কঠোর নিষিদ্ধের ব্যাপারে কমিটির রেজুলেশন খাতায় উঠানো হয়েছে কিনা মুফতী মনসূরুল হক থেকে জানতে চান। তিনি উঠানো হয়েছে বলে জানান। তখন শাইখুল হাদীস ছাহেব ভীষণ রাগ হয়ে বলেন যে, কেন ঐ সিদ্ধান্ত খাতায় উঠানো হলো? আমরা উস্তাদগণ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা কমিটির রেজুলেশন খাতায় তুলব। মুফতী মনসূরুল হক যতই বলেন যে, উস্তাদদের সিদ্ধান্ত কমিটির রেজুলেশন খাতায় তোলা আইন সংগত নয় কিন্তু শাইখুল হাদীস ছাহেব তা মানতে রাজী হন নাই বরং মুফতী মনসূরুল হককে দোষারোপ করতে থাকেন এবং জানতে চান যে, কমিটি এতদিন অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করে নাই, এখন এত বছর পরে তারা কেন এসব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ শুরু করেছে। জনাব মাওঃ হিফজুর রহমান ছাহেব তখন বলেন যে, এটা জানতে চাইলে উস্তাদদের আম মজলিসে সম্ভব নয়। তাতে আপনার বা আমাদের অপমান হতে পারে। সুতরাং জানতে চাইলে খাস মিটিং-এর ব্যবস্থা করেন। তখন শাইখুল হাদীস ছাহেব চুপ হয়ে যান। তারপরে তিনি ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে উস্তাদদের থেকে লিখিত বা মৌখিক খোলামেলা বক্তব্য জানতে চান। এরপর সকলে চুপ থাকায় অনেকক্ষণ পিড়াপিড়ি করেন কিন্তু ঐ অধিবেশনে উস্তাদগণের কেউ ছাত্র রাজনীতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন নাই। পরে কেউ লিখিত বক্তব্যও পেশ করেন নাই।" (চিত্র: পৃষ্ঠা ১৯-২১)

তিন পৃষ্ঠায় লিখিত এই প্রতিবেদনের শেষ পৃষ্ঠায় সহমত ও সত্যায়নকারী হিসেবে তৎকালীন ১৫ জন মুরুব্বী ও বিভাগীয় দায়িত্বশীল শিক্ষকের দস্তখত রয়েছে। দস্তখতকারীগণ হলেন- ১. মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব, ২. মুফতী মনসূরুল হক সাহেব, ৩. মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম মীযান সাহেব, ৪. মাওলানা আব্দুল হামীদ খুলনাবী সাহেব, ৫. মাওলানা ইসহাক চাটগামী সাহেব, ৬. মাওলানা নোমান আহমদ সাহেব, ৭. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক মানিকগঞ্জী সাহেব, ৮. মাওলানা ইবরাহীম হেলাল সাহেব, ৯. মাওলানা হেলালুদ্দীন আহমাদ গাজীপুরী সাহেব, ১০. মাওলানা মীযানুর রহমান কাসেমী সাহেব, ১১. মুফতী সাঈদ আহমাদ সাহেব, ১২. মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেব, ১৩. হাফেজ আব্দুল ওয়াহহাব সাহেব, ১৪. ক্বারী ফরিদুদ্দীন সাহেব, ১৫. ক্বারী মুফীজুল ইসলাম সাহেব।

উল্লেখ্য ২০০১ সালে শাইখপরিবার কর্তৃক জামিআ রাহমানিয়া দখলের পর উল্লিখিত দস্তখতকারীদের মধ্যে মাওলানা ইসহাক চাটগামী সাহেব দা.বা., মাওলানা নোমান আহমদ সাহেব রহ., ক্বারী ফরিদুদ্দীন সাহেব দা.বা. ও ক্বারী মুফীজুল ইসলাম সাহেব দা.বা. রাহমানিয়া ভবনে থেকে গিয়েছিলেন। আর দস্তখতকারীগণ ব্যতীত মুরুব্বী শিক্ষকগণের মধ্যে মুফতী হিফজুর রহমান কুমিল্লায়ী দা.বা. শাইখ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। অবশ্য মুফতী হিফজুর রহমান কুমিল্লায়ী দা.বা.-কে শাইখ রহিমাহুল্লাহ রাহমানিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর মাওলানা নোমান আহমাদ সাহেব রহ.-এর মধ্যস্ততায় এবং নিয়মমাফিক মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. এবং মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব দা.বা.-এর সুপারিশক্রমে তৎকালীন পরিচালনা কমিটি জামিআ রাহমানিয়ায় সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

ছাত্রদেরকে রাজনীতিতে জড়ানো ব্যতীত আরও কিছু বিষয় দ্বিপাক্ষিক এ মতবিরোধে প্রভাব ফেলেছিল। নমুনা হিসেবে একটা বিষয় তুলে ধরা হচ্ছে। সেটা হল-

পরিবারের সদস্যদের রাহমানিয়ায় শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে প্রশ্নবিদ্ধ প্রক্রিয়া অবলম্বন এবং রাহমানিয়াকে পারিবারিক প্রতিষ্ঠান বানানোর প্রচেষ্টা

এ প্রসঙ্গে মূল আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার শিক্ষক নিয়োগের মূলনীতি জেনে নিলে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে।

জামিআ রাহমানিয়ায় শিক্ষক নিয়োগের মূলনীতি

২৯/০৪/১৯৯৪ ইং সনে অনুষ্ঠিত পরিচালনা কমিটির ৫৪ নং অধিবেশনের নিম্নলিখিত অংশটুকু লক্ষ্য করুন-

"(৪) জামিআর কিতাব বিভাগে দুইজন নতুন শিক্ষক রাখার ব্যাপারে আলোচনা হয় এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, শিক্ষক নিয়োগ ও অব্যাহতি দানের ব্যাপারে একটি স্থায়ী সাবকমিটি থাকবে। সাবকমিটির সদস্যবৃন্দ (ক) শাইখুল হাদীস মাওঃ আজীজুল হক ছাহেব (খ) মাওঃ মনসূরুল হক (গ) মাওঃ হিফজুর রহমান ছাহেব। উক্ত সাবকমিটি প্রাথমিক নিয়োগ দান করবেন। অতঃপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কমিটির নিকট পেশ করবেন। এ ব্যাপারে আরো একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, জামিআয় শিক্ষক নিয়োগের মাপকাঠি থাকবে ইলম ও আমল, সেই সাথে ছাত্র গড়ার যোগ্যতা। এই যোগ্যতার ভিত্তিতে যিনি বেশী উপযুক্ত বিবেচিত হবেন তিনিই জামিআয় শিক্ষকতার সুযোগ পাবেন। এই মাপকাঠিতে জামিআর কোন শিক্ষক বা সদস্যের ছাহেবযাদা [পুত্র] যদি যোগ্য বিবেচিত হন তাহলে তাকেই শিক্ষক হিসাবে জামিআতে গ্রহণ করা হবে। জামিআর শিক্ষক বা সদস্যের ছাহেবযাদা হওয়ায় তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে না, তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা থেকে জামিআকেও বঞ্চিত করা হবে না।" [কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশন: অধিবেশন-৫৪, পৃষ্ঠা নং ৯০। উল্লেখ্য, এই অধিবেশনে শাইখুল হাদীস রহিমাহুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন এবং তার স্বাক্ষরও রয়েছে।] (চিত্র: পৃষ্ঠা ২৯)

শাইখ রহিমাহুল্লাহর আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাঁর সন্তান-সন্ততিগণ জামিআ রাহমানিয়ায় শিক্ষকতা করুক এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করুক। একজন পিতা হিসেবে তাঁর এ আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই সম্মানযোগ্য এবং এ ব্যাপারে জামিআ কর্তৃপক্ষও যে উদার মনোভাব পোষণ করতেন উল্লিখিত রেজুলেশন এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

অনুরূপভাবে উল্লিখিত রেজুলেশনে উস্তাদ নিয়োগ-বিয়োগের জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি স্থায়ী সাবকমিটিও গঠন করে দেয়া হয়। নিয়ম অনুযায়ী উক্ত সাবকমিটি একমত হলেই কেবল কোন উস্তাদ প্রাথমিক নিয়োগ পেতেন কিংবা অব্যাহতি লাভ করতেন।

ঘটনা-১ শাইখপুত্র মাওলানা মাহফূজুল হক সাহেব যখন ১৯৯২/৯৩ খ্রিস্টাব্দে পড়াশোনা শেষ করেন তখন তাকে জামিআ রাহমানিয়ার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাবে সাবকমিটির সকলে একমত হতে পারেননি। অমতের প্রেক্ষিতে শাইখ রহিমাহুল্লাহ একপর্যায়ে বলেন যে, মাহফূজকে রাহমানিয়ায় শিক্ষক না রাখলে আমি তাকে বাসায় রেখে হাদীসের বঙ্গানুবাদের প্রশিক্ষণ দিবো এবং সেক্ষেত্রে আমিও মাদরাসায় নিয়মিত সময় দিতে পারবো না। শাইখ রহিমাহুল্লাহ খুব সাদাসিধা মানুষ ছিলেন। কেউ হয়তো তাঁকে এই কৌশলের কথা শিখিয়ে দিয়েছিল। যাই হোক, শাইখ রহিমাহুল্লাহর উক্ত কথার পর অন্যরা বিপাকে পড়ে যান এবং বাধ্য হয়েই মাহফূজুল হক সাহেবকে শিক্ষক নিয়োগ দেন। কারণ, শাইখ রহিমাহুল্লাহর নিয়মিত দরস না দেয়াটা কোনওভাবেই তাদের কাম্য ছিল না।

ঘটনা-২ অনুরূপভাবে শাইখপুত্র মাওলানা মামুনুল হক সাহেবকেও শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে শাইখ রহিমাহুল্লাহ

কমিটির তৎকালীন সভাপতি আব্দুল মালেক সাহেবের নিকট প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং সাবকমিটির তৃতীয় সদস্য মাওলানা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী সাহেবকেও বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে শাইখ রহিমাহুল্লাহ তাকে বলেছিলেন, "আমার ইন্তেকালের পর মনসূর তোমাদেরকে এখানে রাখবে না; এজন্য মামুনকে উস্তাদ বানানো খুব জরুরী। মামুন তোমাদের পক্ষের লোক। আমি হায়াতে থাকা অবস্থায়ই মামুনকে রাখো। তোমাদের দল ভারী করো। মনসূর তাকে কোনভাবেই ঠেকাতে পারবে না। এখন তুমি যদি মামুনের ব্যাপারে মত দাও তাহলে আমি মনসূরকেও জিজ্ঞেস করবো না।" কিন্তু সভাপতি আব্দুল মালেক সাহেব এবং মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবগণ কেউ শাইখ রহিমাহুল্লাহর উক্ত প্রস্তাবে রাজি হননি, ফলে মাওলানা মামুনুল হক সাহেব তখন রাহমানিয়ায় শিক্ষক হতে পারেননি। শাইখ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে পরিচালনা কমিটি ও শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সাবকমিটির অপরাপর সদস্যদের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টির এটিও অন্যতম একটি কারণ।

উল্লেখ্য, মাওলানা মাহফুজুল হক সাহেবের উল্লিখিত প্রশ্নবিদ্ধ নিয়োগের পর শাইখ রহিমাহুল্লাহর একজন দৌহিত্র মাওলানা হাসান আহমাদ সাহেবও জামিআ রাহমানিয়ার শিক্ষক হয়েছিলেন। যিনি ০১/০৭/২০০০ তারিখে রাতের আঁধারে ছাত্রঅভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রের দায়ে কমিটির ০২/০৭/২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের সিদ্ধান্তক্রমে বহিষ্কৃত হয়েছেন।

অনুরূপভাবে শাইখ রহিমাহুল্লাহর আরেক পুত্র মাওলানা মাহবুবুল হক সাহেবকেও শাইখ রহিমাহুল্লাহর প্রস্তাবে-হাজিরা খাতায় নাম থাকবে না, বিনা বেতনে পড়াবে-শর্তে শিক্ষক রাখা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, ২০০১ খ্রিস্টাব্দের বেআইনী দখলদারিত্বের পর জামিআ রাহমানিয়ার পাঁচতলা ভবনটি শাইখ রহিমাহুল্লাহর পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষক হাজিরা খাতা এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। এই হাজিরা খাতায় শাইখ-পরিবারের নিম্নলিখিত ০৯ জন সদস্যের নাম শিক্ষক হিসেবে উর্দূভাষায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। যথা- ১. হযরত মাওলানা মাহফুজুল হক ছাহেব মুদ্দাযিল্লুহু (পুত্র)। ২. হযরত মাওলানা হাসান আহমাদ ছাহেব মুদ্দাযিল্লুহু (দৌহিত্র)। ৩. হযরত মাওলানা মামুনুল হক ছাহেব মুদ্দাযিল্লুহু (পুত্র)। ৪. হযরত মাওলানা ইনআমুল হক ছাহেব (দৌহিত্র)। ৫. জনাব মাওলানা মাহবুবুল হক ছাহেব (পুত্র)। ৬. জনাব মাওলানা আনীসুর রহমান ছাহেব (দৌহিত্র)। ৭. জনাব মাওলানা নাঈমুল হক ছাহেব (দৌহিত্র)। ৮. জনাব মাওলানা এহসানুল হক ছাহেব (দৌহিত্র)। ৯. জনাব মাওলানা আব্দুল্লাহ ছাহেব (দৌহিত্র)।

পরিচালনা কমিটির সতর্কীকরণ এবং বিভিন্ন পদক্ষেপের ধারাবাহিক বিবরণ

উল্লিখিত কারণসমূহ বিশেষত ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়ানোর ফলে মাদরাসার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিনষ্ট হচ্ছিল। উদাহরণত শিক্ষকদের সাপ্তাহিক মশওয়ারায় কিংবা বিভাগীয় যিম্মাদারদের সঙ্গে পূর্ব-আলোচনা ছাড়াই হুটহাট দু-একজন শিক্ষককে ফোন করে ছাত্রদেরকে মিটিং-মিছিলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ফলে সিনিয়র শিক্ষকগণ উদাহরণত মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী সাহেব রহিমাহুল্লাহ ঐসব দিনে মাগরিবের পর দাওরার ছাত্রদেরকে দরসে পাচ্ছিলেন না এবং বিভাগীয় যিম্মাদারগণেরও এ ব্যাপারে অনবগতির বিষয়টি প্রকাশ করে ওযর পেশ করতে হচ্ছিল। এদিকে মিটিং-মিছিলে গিয়ে বিভিন্ন সময় কিছু ছাত্র গ্রেফতার হওয়ার কারণে অভিভাবকদের পক্ষ হতেও চাপ সৃষ্টি হচ্ছিল। ইত্যাকার নানাবিধ সমস্যার কারণে কমিটির সদস্যগণ শাইখ রহিমাহুল্লাহকে এ ব্যাপারে আদবের সাথে সর্বসম্মত কানুনগুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু উপস্থিত তা মেনে নিয়েও কিছুদিন পরপর সম্ভবত পারিপার্শ্বিকতার কারণে শাইখ রহিমাহুল্লাহ পুনরায় সেগুলো বিস্মৃত হচ্ছিলেন।

প্রথম পদক্ষেপ: প্রিন্সিপ্যালভাতা বহাল রেখে শাইখ রহিমাহুল্লাহকে "প্রিন্সিপ্যাল" পদের পরিবর্তে "শাইখুল জামিআ" পদে পদোন্নতি এবং মাওলানা বাহাউদ্দীন গাজীপুরী সাহেবকে অস্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগ

শাইখ রহিমাহুল্লাহ সে সময় জামিআর প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন এবং মুফতী মনসূরুল হক সাহেব ছিলেন ভাইস প্রিন্সিপ্যাল। তো বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও যখন স্থায়ী কোন সমাধান হচ্ছিল না, তখন সংকট নিরসনে কমিটির লোকজন স্বয়ং শাইখ রহিমাহুল্লাহ ও অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাঁকে জামিআর সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ "শাইখুল জামিআ" পদে লিখিত নিয়োগ দিয়ে প্রশাসনিক পদ তথা প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি গ্রহণের আবেদন জানান। আবেদনের প্রেক্ষিতে শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলেন যে, (মুফতী) মনসূর যদি ভাইস প্রিন্সিপ্যালের পদ থেকে অব্যাহতি নেয় তাহলে আমিও প্রিন্সিপ্যালের পদ থেকে অব্যাহতি নিতে সম্মত আছি। কমিটির সদস্যগণ মুফতী সাহেবের নিকট তার পদ থেকে সরে যাওয়ার আবেদন জানালে তিনিও স্বেচ্ছায় ভাইস প্রিন্সিপ্যালের পদ থেকে সরে যেতে সম্মত হন। উল্লেখ্য, প্রিন্সিপ্যাল পদ থেকে শাইখুল জামিআ পদে পদোন্নতির মূল কারণ তো সেগুলোই যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে শাইখ রহিমাহুল্লাহর শান ও মর্যাদার দিকটি লক্ষ্য রেখে কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশনে কারণগুলোকে আদবপূর্ণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ০১/০৮/১৯৯৯ ঈসায়ী তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির ৮৯ নং অধিবেশনের রেজুলেশনটি লক্ষ্য করুন-

"অদ্য ১/৮/৯৯ ইং মুতাবিক ১৮ রবি-২, ২০ হি রোজ রবিবার বাদ মাগরিব রাত ৮ ঘটিকায় জনাব সভাপতি সাহেবের ১৫ তেজগাঁওস্থ বাসায় জনাব হাজী আব্দুল মালেক ছাহেব এর সভাপতিত্বে জামিআ পরিচালনা পরিষদের এক জরুরী অধিবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গৃহীত প্রস্তাবসমূহ-

(ভূমিকা)

জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া-এর তা'লীম-তরবিয়ত ও অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা এবং সুষ্ঠু পরিচালনা ও সর্বদার প্রয়োজনের সুরাহা করার জন্যই শাইখুল হাদীস দা.বা. ছাহেবকে প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব দেয়া হয়। শাইখুল হাদীস ছাহেব এর বহু পূর্ব হতেই সারা দেশময় অনেক মাদরাসার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এবং বার্ষিক সভাসমূহে যোগদানে বাধ্য হয়ে থাকেন। ইহা ছাড়াও তার ইসলাম ও জাতীয় কাজেও অংশগ্রহণ করতে হয়। সেই সব প্রয়োজনের লক্ষ্যে মুফতী মাওলানা মনসূরুল হক ছাহেবকে মুফতীর দায়িত্ব ছাড়াও ভাইস প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্বও পূর্ব হতে দেয়া হয়। ধীরে ধীরে দ্বীনী প্রয়োজনে মুফতী মনসূরুল হক ছাহেব-এরও অনেক কাজে বাইরের সাথে ব্যস্ততা বেড়ে যায়। যে কারণে জামিআর অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন সমাধায় ও দায়িত্ব পালনে তার কাজে স্বাভাবিকভাবেই বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অনেক সময়ই তার ঐসব কারণে জামিআর হঠাৎ প্রয়োজনে তার উপস্থিতি থাকে না। বিষয়টি জামিআর সভাপতি হাজী আব্দুল মালেক ছাহেবও উপলব্ধি করেন। এমনকি জামিআর সেক্রেটারী হাজী আহম্মদ ফজলুর রহমান ছাহেবও অনুভব করেছেন।

এ প্রেক্ষাপটে ২৬/০৭/৯৯ ইং তারিখে জামিআ পরিচালনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য সভাপতি ছাহেব জামিআর দফতরে আসেন। জনাব শাইখুল হাদীস ছাহেব মুফতী মনসূরুল হক ছাঃ, মাওঃ হিফজুর রহমান ছাহেব, কারী মুজাফফর হোসেন ছাহেব, হাজী নূরুল গনী ছাহেবসহ বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। শাইখুল হাদীস ছাহেব-এর ব্যস্ততার কথাটি সর্বস্বীকৃতই। মুফতী ছাহেবও নিজের ব্যস্ততা স্বীকার করেন এবং সামনে দ্বীনের জরুরতে আরও ব্যস্ততা বাড়তে পারে বলে মত প্রকাশ করেন।

এই প্রেক্ষিতে জামিআর প্রয়োজনে সমস্যা সমাধানের জন্য জনাব সভাপতি ছাহেব পরামর্শদান রূপে বলেন যে, বর্তমান প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল ব্যবস্থার পরিবর্তে শাইখুল জামিআ এবং সার্বক্ষণিকের জন্য একজন মুহতামিম নিয়োগের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। উপস্থিত সকলে উক্ত প্রস্তাব ভালো বলে মত প্রকাশ করেন।

অতঃপর মুহতামিম এর জন্য জামিআর উস্তাদ জনাব মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী দা.বা. এর নাম পেশ করা হয়। শাইখুল হাদীস ছাহেব সহ সকলেই উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং শাইখুল হাদীস ছাহেবকে পাহাড়পুরী হুযূরের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য অনুরোধ করা হয়। জনাব শাইখুল হাদীস ছাহেব উনার সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করলে এ দায়িত্বের ব্যাপারে উনার জন্য মোটেও সময় দেয়া সম্ভব নয় বলে তিনি ওযরখাহী করেন।

অতঃপর ২৮/০৭/৯৯ ইং তারিখে জামিআ ভবনের নূরানী তা'লীমুল কুরআন এর দফতরে পূর্বের ন্যায় সভাপতি ছাহেব জনাব শাইখুল হাদীস ছাহেব, মুফতী ছাহেব, মুমিনপুরী ছাহেব, জনাব কারী মুজাফফর হোসেন ছাহেব, জনাব হাজী নূরুল গনী ছাহেব উল্লিখিত বিষয় সমাধানের লক্ষ্যে একত্রিত হয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল ব্যবস্থার পরিবর্তে শাইখুল জামিআ ও সার্বক্ষণিক মুহতামিম নিয়োগে মাদরাসা পরিচালিত হবে এ সিদ্ধান্তে একমত প্রকাশ করেন এবং জনাব মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী ছাহেবকে এ দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য জনাব সভাপতি ছাহেব আবারও প্রস্তাব করেন। সেমতে পাহাড়পুরী ছাহেবকে মজলিসে আনার জন্য জনাব কারী মুজাফফর হোসেন ছাহেবকে দাওরায়ে হাদীসের দরসে প্রেরণ করা হয়। জনাব কারী মুজাফফর হোসেন ছাহেব শাইখুল হাদীস ছাহেবের কথা বলে উনাকে মজলিসে আসার জন্য অনুরোধ জানান। তার পরে মজলিসের সকলেই পাহাড়পুরী ছাহেবের অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু পাহাড়পুরী ছাহেব সবক শেষ করে মজলিসে না এসে চলে যান। এ খবর জানতে পেরে জনাব সভাপতি ছাহেব মুহতামিম নিয়োগের ব্যাপারটি জনাব শাইখুল হাদীস ছাহেবের উপর ন্যস্ত করেন । সে মতে জনাব শাইখুল হাদীস ছাহেব জামিআর উস্তাদ জনাব মাওলানা বাহাউদ্দীন ছাহেব গাজিপুরী হুযূরকে অস্থায়ীভাবে মুহতামিম নিয়োগ করেন এবং উপস্থিত সকলে উহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন এবং প্রস্তাব করেন যে, জনাব সেক্রেটারী ছাহেব এবং শাইখুল জামিআ ছাহেব সার্বক্ষণিক সময় দিতে পারবেন না বিধায় অস্থায়ী মুহতামিম জনাব গাজিপুরী হুযূর জামিআর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে আর ব্যয়ের ভাউচারে স্বাক্ষর করবেন এবং জরুরী কাগজপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং সময় সময় জনাব শাইখুল হাদীস ছাহেব এবং সেক্রেটারী ছাহেব থেকে অনুমোদন নিবেন।

অতঃপর ০১/০৮/৯৯ ইং রোজ রবিবার সভাপতি ছাহেব এর নিজ বাসভবনে রাত ৮ঘটিকায় জামিআ পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে জামিআ পরিচালনার ব্যাপারে সমস্যার সমাধানে পূর্বের খুছূসী মিটিংদ্বয়ের আলোচনা ও প্রস্তাবসমূহ আন্তরিক পরিবেশে খোলামেলা আলোচনা করে সকলের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করেন।

উক্ত মজলিসে সম্মানিত সকল সদস্যবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা নিম্নরূপ–

০১. শাইখুল হাদীস ছাহেব প্রিন্সিপাল ও মুফতী মনসূরুল হক ছাহেব ভাইস প্রিন্সিপাল এ ব্যবস্থার পরিবর্তে শাইখুল জামিআ ও সার্বক্ষণিক মুহতামিম নিয়োগে জামিআর কার্যক্রম পরিচালিত হইবে। এবং মুহতামিমের কোন নায়েব থাকিবে না।

০২. মুফতী মনসূরুল হক ছাহেব পূর্বের ন্যায় জামিআর তা'লীম-তরবিয়ত জারী রাখবেন এবং ইন্তেজামী কাজে সার্বিক সহযোগিতা করবেন। সেজন্য তার ভাইস প্রিন্সিপালের ভাতা সুবিধাভাতা হিসেবে বহাল থাকবে।

০৩. নাযেমে তা'লীমাত জনাব মাওঃ হিফজুর রহমান ছাহেব বলেন, জামিআর অধিকাংশ আসাতিযা কেরাম ছাত্রদের রাজনীতি, মিছিল, সভা, রোডমার্চ এগুলোতে অংশগ্রহণ করাকে তা'লীম-তরবিয়তের সুশৃংখলার পরিপন্থী মনে করেন। জনাব শাইখুল হাদীস ছাহেবও এই অভিমত ব্যক্ত করেন। অতঃপর তিনি অত্যন্ত করুণ ও অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেন যে, আমার দ্বারা জামিআর কোন রকম ক্ষতি হওয়ার পূর্বেই যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে মৃত্যু দান করেন!

০৪. উপস্থিত সকল সদস্য একমত হয়ে জনাব শাইখুল হাদীস ছাহেবকে শাইখুল জামিআর সর্বোচ্চ পদে সমাসীন রাখার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এবং হযরত শাইখ এর দীর্ঘায়ু কামনা করেন। আরও প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, হযরত শাইখ এর জন্যই এ পদ, তার ইন্তিকালের পর এ পদ রহিত হইয়া যাইবে।

০৫. জনাব সভাপতি ছাহেব খুবই আবেগ নিয়ে প্রস্তাব করেন যে, শাইখুল হাদীস ছাহেব আজীবন শাইখুল জামিআ হিসেবে আমাদেরকে ছায়াদান করবেন এবং শাইখুল জামিআর পড়ানো, মাদরাসায় উপস্থিতি, ইন্তেজাম-তত্ত্বাবধানের কোন জবাবদিহিতা থাকিবে না। হযরত শাইখুল জামিআর দু'আ এবং ছায়া ইনশাআল্লাহ জামিআর জন্য যথেষ্ট ও অমূল্য হইয়া থাকিবে। জনাব সভাপতি ছাহেব এর এ মূল্যবান প্রস্তাব উপস্থিত সকল সদস্য সর্বান্তকরণে সমর্থন করেন এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে শোকর আদায় করেন

অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় শাইখুল জামিআ ছাহেব আল্লাহ তা"আলার দরবারে দু'আ ও মুনাজাত করেন এবং সভার সমাপ্তি ঘোষণা করে সকলের শুকরিয়া আদায় করেন।" [কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশন: অধিবেশন-৮৯, পৃষ্ঠা ৫৩-৫৭, উল্লেখ্য, এই অধিবেশনে স্বয়ং শাইখ উপস্থিত ছিলেন এবং শাইখের দস্তখতও রয়েছে।] (চিত্র: পৃষ্ঠা ৩০-৩৩)

অতঃপর পরিচালনা পরিষদের ২১/০৯/১৯৯৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ৯০ নং অধিবেশনে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়–

"০৫. বিবিধ আলোচনায় হযরত শাইখুল জামিআ ছাহেব এর প্রিন্সিপালভাতা বহাল [রাখার] ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, উক্ত ভাতা চার শত টাকা শাইখভাতার সাথে যোগ করে দেয়া হবে।" (কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশন: অধিবেশন-৯০, পৃষ্ঠা ৫৮)

দ্বিতীয় পদক্ষেপ: "ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ" কানুনটি বাতিল-প্রচেষ্টার পেক্ষিতে পুনঃপুনঃ সতর্কীকরণ ও রেজুলেশন নবায়ন

কিন্তু শাইখ রহিমাহুল্লাহকে ৮৯ নং অধিবেশনে গৃহীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তসমূহের ০৩ নং সিদ্ধান্ত তথা "জামিআর ছাত্রদের জন্য

রাজনীতি নিষিদ্ধ" অশংটিতে অটল থাকতে দেয়া হয়নি। এর বিবরণ নিম্নরূপ–

"০১/০৮/৯৯ ইং এর [৮৯ নং] অধিবেশনের পর তিনি [শাইখ রহিমাহুল্লাহ] লন্ডন সফরে যান। ঐ সময় ছয় জন ছাত্র রাজনীতিতে হাতেনাতে ধরা পড়ায় জামিআর সিনিয়র উস্তাদগণ সভাপতি ছাহেবের অনুমোদনক্রমে তাদেরকে বহিষ্কার করেন। এ খবর শাইখুল হাদীস ছাহেবকে তার লোকেরা ফোনে জানান এবং মজলিশ অফিসে উক্ত ছাত্রদের রাখেন। তারপর শাইখুল হাদীস ছাহেব সফর থেকে ফিরে এসে সিনিয়র শিক্ষদের সাথে আলোচনা ছাড়া এবং পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়াই তাদেরকে জামিআতে ঢুকিয়ে দেন। এবং এখন থেকে এ কানুন বাতিল করার অভিমত ব্যক্ত করেন এবং বাকায়দা [নিয়মতান্ত্রিক] ছাত্রসংগঠন করার পক্ষে রায় প্রকাশ করেন।"

[সূত্রঃ জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার অফিসিয়াল প্যাডে ১০/০১/২০০০ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুতকৃত ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ কানুন বাতিল প্রচেষ্টার প্রতিবেদন, এ প্রতিবেদনে জামিআর তৎকালীন ১৫ জন শিক্ষকের দস্তখত রয়েছে।] (চিত্রঃ পৃষ্ঠা ১৯)

এই প্রেক্ষিতে পরিচালনা পরিষদ ১৯/১০/১৯৯৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ৯১ নং অধিবেশনে শাইখ রহিমাহুল্লাহকে নতুনভাবে "জামিআয় ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ" কানুনটি স্মরণ করিয়ে দেন। রেজুলেশনটি লক্ষ্য করুন–

"অদ্য ১৯ অক্টোবর ৯৯ ইং মুতাবিক ৮ রজব ২০ হিঃ রোজ মঙ্গলবার সকাল ৭:৩০ মিঃ নূরানী দফতরে জনাব হাজী আব্দুল মালেক ছাহবে এর সভাপতিত্বে জামিআ রাহমানিয়া পরিচালনা পরিষদের এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

০১. গত মিটিংয়ের সিদ্ধান্তসমূহ পঠিত হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে উহা অনুমোদিত হয়।

০২. সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহিত হয় যে, রাজনীতি ছাত্র ও মাদরাসার জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় জামিআ রাহমানিয়ার ছাত্রদের জন্য রাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং ছাত্রগণ কোনরূপ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যথা মিটিং, মিছিল, বিক্ষোভ মিছিল, রোডমার্চ ও সরকারবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না। অবশ্য দীনের বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দিলে রাজনীতি হিসাবে নয় বরং দীনী দায়িত্ব পালন হিসাবে পরিচালনা পরিষদের অনুমতিক্রমে যাইতে পারিবে।

০৩. তেমনিভাবে ছাত্রদের জন্য মাদরাসার অভ্যন্তরে কোন প্রকার ব্যায়াম প্রশিক্ষণেরও অনুমতি নেই।

(ক) শিক্ষকদের রাজনীতি ও বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদানের ব্যাপারে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, হযরত শাইখুল হাদীছ মাওঃ আজীজুল হক ছাহেব (দা.বা.) ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষক এর জন্য এ সব কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

(খ) তাছাড়া আসাতিযা কেরামদের ইমামতির ব্যাপারে প্রস্তাব গৃহিত হয় যে, যে সমস্ত উস্তাদগণ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মাদরাসায় অবস্থান করে মুহাম্মদপুর এলাকায় ইমামতি করছেন, তাদেরকে ছয় মাস পর্যন্ত দেখা হবে। যদি তাদের ইমামতির কারণে মাদরাসার তালীম-তরবিয়তে কোন অসুবিধা না হয়, তাহলে বহাল রাখা হবে, নচেৎ নিষেধ করা হবে। তাদের হালাতের প্রতি খেয়াল রাখবে জনাব মুফতী ছাহেব এবং জনাব মুমিনপুরী ছাহেব।

০৫. কোন সেবাসংস্থার এনজিওর সাথে জামিআ রাহমানিয়ার নিয়মিত কোন যোগাযোগ থাকবে না।

০৬. বেফাকুল মাদারিস এর সাথে শুধুমাত্র তালীম ও তরবিয়ত সংক্রান্ত বিষয়ের যোগাযোগ থাকবে।..." [কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশনঃ অধিবেশন-৯১, পৃষ্ঠা ৫৯-৬০, উল্লেখ্য, এই অধিবেশনে স্বয়ং শাইখ উপস্থিত ছিলেন এবং শাইখের দস্তখতও রয়েছে।] (চিত্রঃ পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫)

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শাইখ রহিমাহুল্লাহ উল্লিখিত ৯১ নং অধিবেশনে নতুনভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়া বিষয়টি পরের দিনই বিস্মৃত হন। নিম্নলিখিত বক্তব্য একথার প্রমাণ বহন করে–

"তারপরে ১৯/১০/৯৯ ইং রেজুলেশন [৯১ নং অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ] মেনে নেয়ার পর ছাত্র-শিক্ষদের একাধিক মজলিসে উক্ত কানুনটি বাতিল করার চেষ্টা চালান। যেমন রেজুলেশন পাশ হওয়ার পরের দিন ২০/১০/৯৯ ইং মোতাবেক ৯ই রজব ১৪২০ হিঃ দাওরায়ে হাদীছের দরছে এবং ২৩/১০/৯৯ ইং মুতাবেক ১২ রজব দাওরার দরছে মোট দুই দিন এ কানুনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন এবং মাওঃ রুহুল আমীন ছাহেব তার কাফিয়া জামাতের তরজমায়ে কুরআন খতমের মজলিশে শাইখুল হাদীস ছাহেবকে নিয়ে যান এবং তখন শরহেজামী ও শরহে বেকায়ার ছাত্রদেরকেও জমা করা হয়। সে মজলিশে মাওঃ রুহুল আমীন বলেন, ছাত্ররাজনীতি নিষেধ, কমিটির এ সিদ্ধান্ত ছাত্রগণ মানতে রাজি না। তখন শাইখুল হাদীস ছাহেব বলেন, আমি তো কিছু করতে পারছি না। তোমরা কমিটির বিরুদ্ধে খতমে ইউনুস পড়ো।

[অতঃপর] উস্তাদদের সাপ্তাহিক মিটিং-এ ২৫/১০/৯৯ ইং মুতাবিক ১৪ রজব "২০ হিঃ তিনি উস্তাদদেরকে ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে খোলাখুলি মতামত ব্যক্ত করতে বলেন এবং বলেন যে, আপনাদের মতামত নিয়ে আমি কমিটির সাথে লড়াই করব। এর প্রেক্ষিতে মাওঃ আশরাফ আলী ছাহেব, মাওঃ আশরাফুজ্জামান ছাহেব এবং মাওঃ হাসান আহমাদ গং ছাত্র রাজনীতির পক্ষে বক্তব্য দেন এবং এ ব্যাপারে কমিটির আইন পাশ করার কোন অধিকার নাই মর্মে উল্লেখ করেন। তখন শাইখুল হাদীস ছাহেবও কমিটির এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাআজ্জুব [বিস্ময়] প্রকাশ করতে থাকেন এবং বলেন, সামনের সাপ্তাহিক মিটিং-এ আপনারা এ ব্যাপারে মনখুলে লিখিত বক্তব্য পেশ করবেন। আমি তা কমিটির মিটিং-এ উঠিয়ে তাদের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে চেষ্টা করব। তদানীন্তন মুহতামিম মাওঃ বাহাউদ্দীন ছাহেব কমিটির নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও কমিটির উক্ত সিদ্ধান্ত ছাত্রদেরকে শুনান নাই এবং তার সহকারী কোন কোন উস্তাদ কমিটিকে ঘাদানিক আখ্যায়িত করেন। অপরদিকে শাইখুল হাদীস ছাহেবের এসব আচরণে অধিকাংশ ছাত্র কমিটির বিরুদ্ধে আন্দোলন মুখর হয়ে ওঠে এবং যে কোন সময় বিস্ফোরণের আশংকা দেখা দেয়। তখন সভাপতি ছাহেব এ খবর জানতে পেরে ২৮/১০/৯৯ ইং মুতাবিক ১৭ রজব ১৪২০ হিঃ জনাব মাওঃ হিফজুর রহমান ছাহেবকে অন্য উস্তাদদের নিয়ে কমিটির মূল সিদ্ধান্ত ছাত্রদের শুনিয়ে দিতে বলেন, যাতে করে সকল ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটে। তার পরে ০১/১১/৯৯ ইং মুতাবিক ২১ রজব ২০হিঃ এর সাপ্তাহিক মিটিং-এর শুরুতে ছাত্র রাজনীতি কঠোর নিষিদ্ধের ব্যাপারে কমিটির রেজুলেশন খাতায় উঠান হয়েছে কিনা মুফতী মনসূরুল হক থেকে জানতে চান। তিনি উঠান হয়েছে বলে জানান। তখন শাইখুল হাদীস ছাহেব ভীষণ রাগ হয়ে বলেন যে, কেন ঐ সিদ্ধান্ত খাতায় উঠান হলো? আমরা উস্তাদগণ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা কমিটির রেজুলেশন খাতায় তুলব। মুফতী মনসূরুল হক যতই বলেন যে, উস্তাদদের সিদ্ধান্ত কমিটির রেজুলেশন খাতায় তোলা আইন সংগত নয় কিন্তু শাইখুল হাদীস ছাহেব তা মানতে রাজী হন নাই বরং মুফতী মনসূরুল হককে দোষারোপ করতে থাকেন এবং জানতে চান যে, কমিটি এতদিন অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করে নাই, এখন এত বছর পরে তারা

কেন এসব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ শুরু করেছে। জনাব মাওঃ হিফজুর রহমান ছাহেব তখন বললেন যে, এটা জানতে চাইলে উস্তাদদের আম মজলিসে সম্ভব নয়। তাতে আপনার বা আমাদের অপমান হতে পারে। সুতরাং জানতে চাইলে খাস মিটিং-এর ব্যবস্থা করেন। তখন শাইখুল হাদীস ছাহেব চুপ হয়ে যান। তারপরে তিনি ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে উস্তাদদের থেকে লিখিত বা মৌখিক খোলামেলা বক্তব্য জানতে চান। এরপর সকলে চুপ থাকায় অনেকক্ষণ পিড়াপিড়ি করেন কিন্তু ঐ অধিবেশনে উস্তাদগণের কেউ ছাত্র রাজনীতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন নাই। পরে কেউ লিখিত বক্তব্যও পেশ করেন নাই।" [সূত্র: জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার অফিসিয়াল প্যাডে ১০/০১/২০০০ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুতকৃত *ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ কানুন বাতিল প্রচেষ্টার প্রতিবেদন*, এ প্রতিবেদনে জামিআর তৎকালীন ১৫ জন শিক্ষকের দস্তখত রয়েছে।] (চিত্র: পৃষ্ঠা ১৯-২১)

মাওলানা বাহাউদ্দীন সাহেবের স্থলে মাওলানা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী সাহেবকে অস্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগ

অতঃপর কমিটির ৮৯ নং অধিবেশনে উল্লিখিত ও নিয়োগপ্রাপ্ত অস্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা বাহাউদ্দীন সাহেবের মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে প্রশাসনিক দুর্বলতা ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার দরুন ১৭/১১/১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কমিটির ৯২ নং অধিবেশনে তাকে অস্থায়ী প্রিন্সিপ্যালের পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এবং তার স্থলে মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবকে শাইখ রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত নোটিশে রাহমানিয়ার অস্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। কমিটির ৯২নং অধিবেশনের নিম্নলিখিত অংশটি লক্ষ্য করুন–

"৪-ক মুহতামিম নিয়োগ এর ব্যাপারে উপস্থিত সদস্যগণ জনাব মাওঃ হিফজুর রহমান ছাহেব (মুমিনপুরী) হুযুর এর নাম প্রস্তাব করেন, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জনাব কারী মুজাফফর হোসেন ছাহেব এবং জনাব নূরুল গনী ছাহেব, জনাব মুমিনপুরী হুযুর থেকে সম্মতি গ্রহণ করবেন। তিনি সম্মতি প্রদান করলে জনাব শাইখুল হাদীস ছাহেব এর অভিমতের আলোকে জনাব সভাপতি ছাহেব, জনাব শাইখুল জামিআ ছাহেব এবং জনাব সেক্রেটারী ছাহেব জনাব মাওঃ বাহাউদ্দীন ছাহেব এর স্থলে অস্থায়ীভাবে পরীক্ষামূলক জনাব মাওলানা হিফজুর রহমান ছাহেবকে অস্থায়ী মুহতামিম হিসাবে নিয়োগ দান করবেন। এবং তা মাদরাসার সামনের ছুটির পূর্বে হবে।" [কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশন: অধিবেশন-৯২, পৃষ্ঠা ৬৩। উল্লেখ্য, এই অধিবেশনে স্বয়ং শাইখ উপস্থিত ছিলেন এবং শাইখের দস্তখতও রয়েছে।] (চিত্র: পৃষ্ঠা ৩৬)

মাওলানা বাহাউদ্দীন সাহেবের মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার বিবরণ

সন্দেহ নেই মাওলানা বাহাউদ্দীন গাজীপুরী সাহেব দা.বা. একজন বিজ্ঞ ও মেধাবী আলেমে দীন ছিলেন। ছাত্রদেরকে তালীম-তরবিয়ত প্রদানে তার বিশেষ দক্ষতা ছিল। কিন্তু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

মাওলানা বাহাউদ্দীন সাহেব প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব পালনকালে বার্ষিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রদের কথাবার্তার কারণে অনেকটা "মাছ-বাজার"-এর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। অথচ ইতোপূর্বে রাহমানিয়ার পরীক্ষাকেন্দ্রে এর কল্পনাও করা যেতো না। বিষয়টি শিক্ষকদের সাপ্তাহিক মিটিং হয়ে একপর্যায়ে কমিটির সভাপতি সাহেবও জানতে পারেন। নূরানী তালীমুল কুরআন ওয়াকফ এস্টেটের মুতাওয়াল্লী হওয়ার সুবাদে এবং আগে থেকেই দীনদার উলামায়ে কেরামের সান্নিধ্যে থাকার কারণে সভাপতি সাহেব ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি বিষয়টি শাইখ রহিমাহুল্লাহর গোচরে আনলে শাইখ তাকে বললেন, বিষয়টি আমি দেখছি, আপনি চিন্তা করবেন না। পরবর্তীকালে সভাপতি সাহেব বিষয়টি নিয়ে মাওলানা বাহাউদ্দীন সাহেবের সঙ্গেও আলোচনা করেন। আর মাওলানা বাহাউদ্দীন সাহেবও এমন সরল মানুষ যে, সভাপতি সাহেবকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে, "আমরা তো বেফাকবোর্ডে অন্তর্ভুক্ত আছি, একটু কথাবার্তার সুযোগ না দিলে ছাত্ররা মেধাতালিকায় আসে না!" এ কথা শুনে সভাপতি সাহেব অত্যন্ত নাখোশ হয়ে বললেন, ইলম চুরি হলে মাদরাসা বানানোর দরকার কী?!

তাছাড়া তাঁর আমলে পূর্বের কয়েক বছরে মিটিং-মিছিলে অভ্যস্ত হয়ে আদব-আখলাক হারানো ছাত্রদের উগ্রতাও নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। ফলে ছাত্ররাজনীতির কালো ছায়া পূর্ববৎ বহাল থেকে যায়। তো এ জাতীয় কিছু কারণে মাওলানা বাহাউদ্দীন সাহেবকে কমিটির লোকজন প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্বে রাখা সমীচীন মনে করেনি। ফলে তাকে অব্যাহতি দিয়ে মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবকে পরীক্ষামূলক অস্থায়ী প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং মাদরাসার কার্যক্রম যথারীতি চলতে থাকে।

তৃতীয় পদক্ষেপ: শাইখ রহিমাহুল্লাহকে সাময়িক অব্যাহতি প্রদান

অতঃপর শাইখ রহিমাহুল্লাহর উপস্থিতিতে মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবকে অস্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১মাস ১৯ দিন পর ০৬/০১/২০০০ খ্রিস্টাব্দ মুতাবেক ২৮ রমাযান ১৪২০ হিজরী তারিখে শাইখ রহিমাহুল্লাহ সাতমসজিদে আসেন এবং মসজিদে ইতিকাফরত অস্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব, মুফতী মনসূরুল হক সাহেব এবং কমিটির কতিপয় সদস্যের সামনে পরিচালনা কমিটির বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ আনেন এবং রমাযানের পর নতুন বছর মাদরাসা খুললে ছাত্র-শিক্ষকদের সমবেত করে পরিচালনা কমিটির বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেয়ার এবং কমিটি ভেঙে দেয়ার কথা বলেন। এসময় কমিটির উপস্থিত সদস্যগণ, মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব এবং মুফতী মনসূরুল হক সাহেব শাইখ রহিমাহুল্লাহকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, হুযুর! এখানে আমরা কয়েকজনমাত্র উপস্থিত, সবাই নেই, তাছাড়া এটা সমাধানের স্থানও না; আপনি সেক্রেটারী সাহেবকে মিটিং ডাকতে বলুন এবং অভিযোগগুলো মিটিংয়ে পেশ করে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করুন। কিন্তু শাইখ রহিমাহুল্লাহ রাজি হলেন না।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে পরিচালনা পরিষদ ঈদুল ফিতরের কয়েকদিন পর ১১/০১/২০০০ খ্রিস্টাব্দে একটি অধিবেশন আহ্বান করেন এবং শাইখ রহিমাহুল্লাহর অভিযোগগুলো নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দুইজন সদস্য মারফৎ তাঁকে অধিবেশনে উপস্থিতির অনুরোধ জানান। শাইখ রহিমাহুল্লাহ অধিবেশনে উপস্থিত হতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, "যা কিছু হবে নতুন বছর মাদরাসা খোলার পর হবে।"

অনাকাঙ্ক্ষিত এই সংকটে পরিচালনা পরিষদ ৯৪ নং অধিবেশনে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়–

"৩. জামিআর সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে জামিআর কতিপয় শিক্ষকবৃন্দের জামিআর স্বার্থবিরোধী আচরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। এবং পরিচালনা পরিষদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যের সাক্ষ্য দ্বারা তা প্রমাণিত হওয়ায় উপস্থিত সকল সদস্য ক্ষুব্ধ হন এবং দুঃখ প্রকাশ করেন। অতঃপর জামিআর সুষ্ঠু

পরিচালনার লক্ষ্যে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

(ক) জামিআর ছাত্র ভর্তির নিয়ম হবে নিম্নরূপ। নাযিমে দারুল ইকামা জনাব মাওঃ আব্দুর রাজ্জাক ছাহেব, নাযিমে তালীমাত জনাব মাওঃ ইবরাহীম হেলাল ছাহেব, মুহতামিম/রঈস মাওঃ হিফজুর রহমান ছাহেব এর দস্তখতে ছাত্র ভর্তি হবে। অন্য কোন দস্তখতে ছাত্রভর্তি কোনরূপ গ্রহণযোগ্য হবে না।

(খ) শাইখুল হাদীস হযরত মাওঃ আজীজুল হক ছাহেব (দাঃ বাঃ) এর ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তাঁর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকায়, ইসলাম ও দেশের স্বার্থে নানান ব্যবস্থা [গ্রহণে বাধ্য হওয়ায়] ও বয়োবৃদ্ধজনিত সমস্যার কারণে তাঁকে জামিআর তালীম-তরবিয়তসহ সকল জিম্মাদারী থেকে সামঃ অবসর দেয়া হোক এবং কষ্ট করে জামিআতে না আসার জন্য তাঁকে জানানো হোক।

জামিআর প্রতি তাঁর অনেক অবদান থাকার কারণে তাঁর মাসিক সম্মানী বহাল রাখার এবং উক্ত ভাতা তাঁর বাসায় পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(গ) জনাব মাওঃ বাহাউদ্দীন ছাহেব, জনাব মাওঃ রুহুল আমীন ছাহেব, জনাব মাওঃ আশরাফ আলী ছাহেব ও জনাব হাফিয আব্দুল হাই ছাহেবকে তাঁদের জামিআর স্বার্থবিরোধী আচরণ প্রমাণিত হওয়ায় জামিআ শিক্ষকতার দায়িত্ব (চাকুরী) থেকে টার্মিনেট (অবসান) করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং তার নোটিশ লোক মারফত এবং ডাক মারফত জানিয়ে দেয়ার এবং প্রত্যেককে তিন মাসের মূল বেতন ড্রাফট করে পাঠিয়ে দেয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।...

৫. বিবিধ (ক) জামিআ রাহমানিয়ার ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য রাজনীতি কঠোর নিষিদ্ধ। মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ জামিআর কানুনবিরোধী ও মারাত্মক অপরাধ। কোন ছাত্র-শিক্ষক এ আইন অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আরো প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, এ আইন বহাল রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট নেগরান উস্তাদ জিম্মাদার থাকবেন। কোন ছাত্র জামিআ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনরূপ মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট উস্তাদ কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকবেন। [কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশনঃ অধিবেশন-৯৪, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৮]

চতুর্থ পদক্ষেপঃ ২৫ দিন পর আল্লামা নূরুদ্দীন গহরপুরী রহ.-এর মধ্যস্থতায় শাইখ রহিমাহুল্লাহর পুনঃনিয়োগ

অতঃপর যথারীতি নতুন বছর শুরু হয় এবং ভর্তি কার্যক্রম শেষে পড়াশোনা শুরু হয়। এদিকে একটা বিশেষ সাময়িক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে শাইখ রহিমাহুল্লাহকে সাময়িক অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। এই অব্যাহতি প্রদানের পর অনতিবিলম্বে পুরো ব্যাপারটি দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী, তৎকালীন বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার সভাপতি এবং জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার বিশেষ মুরুব্বী আল্লামা নূরুদ্দীন গহরপুরী রহিমাহুল্লাহকে অবগত করা হয়। তিনি সব শুনে পরিচালনা কমিটির নিকট সুপারিশ করেন যে, শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহিমাহুল্লাহকে অন্য কোন দায়িত্ব না দিয়ে শুধু বুখারী শরীফের দরস প্রদানের সুযোগ করে দেয়া হোক। কমিটি তা সানন্দে মেনে নেন এবং উল্লিখিত সাময়িক অব্যাহতি প্রদানের মাত্র ২৫ দিনের মাথায় ০৫/০২/২০০০ ঈসায়ী মোতাবেক ২৮ শাওয়াল অর্থাৎ রমাযানের পর মাদরাসা খোলার ১৮/১৯ দিন পর একটি রেজুলেশনের মাধ্যমে শাইখ রহিমাহুল্লাহকে পুনরায় বুখারী শরীফের দরস প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রেজুলেশনটি লক্ষ্য করুন–

"(২) জনাব হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন গহরপুরী হুযুর (দা.বা.) এর পক্ষ থেকে জনাব হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা আজীজুল হক ছাহেব (দা.বা.)-কে দ্বিতীয়বার শুধুমাত্র বুখারী শরীফ-এর একটি দরসের সুযোগদানের সুফারিশ এর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা হয়। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

(ক) জনাব শাইখুল হাদীস মাওঃ আজীজুল হক ছাহেব (দা.বা.) জনাব মাওঃ নূরুদ্দীন গহরপুরী ছাহেবকে লিখবেন যে, বার্ধক্যজনিত কারণে জামিআ রাহমানিয়ার অভ্যন্তরীণ ও প্রশাসনিক কোন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আপনার সুফারিশে শুধুমাত্র বুখারী শরীফের একটা দরস দিতে আমি সম্মত আছি। আমি জামিআ রাহমানিয়ার কোন ছাত্র-শিক্ষককে কোন প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত করিতে চেষ্টা করিব না। আমি আরো উল্লেখ করছি যে, জামিআ রাহমানিয়ার পরিচালনা কমিটি এবং স্থায়ী কমিটির প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা আছে। কমিটিদ্বয় আমার ব্যাপারে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বা ভবিষ্যতে গ্রহণ করবে তা আমি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছি এবং ভবিষ্যতেও ইনশাআল্লাহ গ্রহণ করব।

(খ) হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেব (দা.বা.) জাতীয় পত্র-পত্রিকায় এ মর্মে একটি প্রেস রিলিজ দিবেন যে, পত্র-পত্রিকায় জামিআ রাহমানিয়ার কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তকর যে সব খবরাখবর প্রকাশিত হয়েছে এ সব কিছু আমার সিদ্ধান্তের বাইরে। এর কোন কিছুর সাথে আমি একমত নই। এবং এ সমস্ত কাজে আমি সন্তুষ্টও নই, আমি এ সব কাজের বিরোধিতা করছি এবং ঘোষণা করছি যে, আমি জামিআ রাহমানিয়া এর কমিটির সিদ্ধান্তের সাথে সম্পূর্ণ একমত।

(গ) উল্লেখিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন এবং তদারকী করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে একটি সাবকমিটি গঠন করা হয়। সাবকমিটির সদস্য হলেন, জনাব মাওলানা নূরুদ্দীন গহরপুরী হুযূর, জনাব হাজী মুহাম্মদ আলী ছাহেব, জনাব হাফিজ এনায়েতুল্লাহ ছাহেব, জনাব হাজী নূরুল গনী ছাহেব, জনাব ক্বারী মুজাফফর হোসেন ছাহেব।" [কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশনঃ অধিবেশন-৯৬, পৃষ্ঠা ৭১-৭৩]। (চিত্রঃ পৃষ্ঠা ৩৭)

আল-মারকাজুল ইসলামী'র মুফতী শহীদুল ইসলাম সাহেব-এর অবাক্কাণ্ড

অতঃপর শাইখ রহিমাহুল্লাহ ২য় বার মাদরাসায় তাশরীফ আনেন এবং বুখারী শরীফের দরস প্রদান শুরু করেন। উল্লেখ্য, শাইখ রহিমাহুল্লাহ নতুনভাবে দরস প্রদান শুরু করার কিছুদিন পর শাইখ রহিমাহুল্লাহর পৌত্রা আল-মারকাজুল ইসলামীর চেয়ারম্যান মুফতী শহীদুল ইসলাম সাহেব মাদরাসার চতুর্থতলায় ছাত্র-শিক্ষকদের মজমায় শাইখ রহিমাহুল্লাহকে চেয়ারে বসিয়ে কমিটির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কঠোর সমালোচনায় লিপ্ত হন এবং শাইখ রহিমাহুল্লাহর তৎকালীন রাজনৈতিক কিছু সিদ্ধান্ত ও সেগুলোর গণসমালোচনার হাস্যকর জবাব প্রদান করেন। উদাহরণত তিনি বলেন, "ছাত্র ভাইয়েরা! তোমাদের কারও মনে আপত্তি উঠতে পারে যে, শাইখুল হাদীস সাহেব এত বড় আলেম হয়েও কিভাবে খালেদা জিয়ার সঙ্গে মিটিং করেন, সামনাসামনি কথা বলেন! আচ্ছা বলো তো, বিবাহ করার নিয়তে গায়রে মাহরাম মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েয আছে কিনা?" ছাত্ররা উত্তর দিল, জায়েয আছে। অতঃপর মুফতী শহীদ সাহেব বললেন, "তোমরা ব্যাপারটাকে এই দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে তো আপত্তি থাকার কথা নয়! শাইখুল হাদীস সাহেব কি খালেদা জিয়ার দিকে এই নিয়তে দৃষ্টিপাত করতে পারেন না?!" তার এই বক্তব্য উপস্থিতিদের মধ্যে ব্যাপক হাস্যরসের সৃষ্টি করে।

মুফতী মনসূরুল হক সাহেব ও মাওলানা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী সাহেব যেন রাহমানিয়া ছেড়ে না যান এ ব্যাপারে মাওলানা আবরারুল হক হারদূয়ী রহিমাহুল্লাহর নিষেধাজ্ঞা

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহিমাহুল্লাহর সর্বশেষ জীবিত খলীফা ছিলেন হযরত মাওলানা আবরারুল হক হারদূয়ী রহিমাহুল্লাহ। বাংলাদেশের বড় বড় উলামায়ে কেরাম ছিলেন তার মুরীদ ও খলীফা। মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব রহিমাহুল্লাহ, আল্লামা মাহমূদুল হাসান দা.বা. তাদের অন্যতম। এই ধারাবাহিকতায় জামিআ রাহমানিয়ার মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. এবং মাওলানা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী দা.বা.-ও তার বিশিষ্ট খলীফাদের অন্তর্ভুক্ত। হারদূয়ী হযরতের এই দুই খলীফা রাহমানিয়ার তৎকালীন সংকট ও জটিলতা নিয়ে নিজ পীর ও মুর্শিদের সঙ্গে পরামর্শ করে চলতেন। শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহিমাহুল্লাহর ২য় বার রাহমানিয়ার দরস প্রদান শুরু করার কিছুদিন পর ১৪২০ হিজরীর হজ্জের মাসে জামিআর তৎকালীন অস্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী সাহেব হজ্জের সফরে যান। এ সফরে মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবকে দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন আলেমে দীন–যাদের মধ্যে হযরত হারদূয়ী রহিমাহুল্লাহর কয়েকজন খলীফাও ছিলেন– বললেন যে, দেখুন! মাদরাসার অবস্থা সম্পর্কে যতটুকু শুনেছি, এই পরিস্থিতিতে আমাদের পরামর্শ হলো, আপনি আর মুফতী সাহেব রাহমানিয়া ছেড়ে চলে যান। আপনারা যেখানেই যাবেন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব তাঁদেরকে বললেন, আপনাদের খায়েরখাহী নিঃসন্দেহে ইখলাসপূর্ণ কিন্তু আমি তো আমার মুরুব্বী হারদূয়ীর হযরতের সঙ্গে পরামর্শ না করে সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। আর হারদূয়ীর হযরতও হজ্জের সফরে এসেছেন, সুতরাং তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই সিদ্ধান্ত জানাবো। অতঃপর মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব হারদূয়ীর হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উল্লিখিত উলামায়ে কেরামের পরামর্শ শোনালেন। সব শোনার পর হারদূয়ীর হযরত রহিমাহুল্লাহ মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা দুজন রাহমানিয়া ছেড়ে চলে গেলে রাহমানিয়ার তালীম-তরবিয়তের কোনও ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে কি? জবাবে মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব বললেন, কিছু তো আশংকা আছে। এবার হারদূয়ীর হযরত বললেন, তাহলে তো আপনাদের জন্য কিছুতেই রাহমানিয়া ছাড়ার অনুমতি নেই। আপনারা থাকা অবস্থায় যদি কেউ বিশৃঙ্খলা করে তাহলে তার দায় তার উপর বর্তাবে। আর আপনারা চলে যাওয়ার কারণে যদি মাদরাসার কোন ক্ষতি হয় তাহলে সেটার দায় আপনাদের উপরে আসবে। এ প্রসঙ্গে হারদূয়ীর হযরত রহিমাহুল্লাহকে মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব আরও জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, 'শাইখুল হাদীস সাহেব তো আমাদের উস্তাদ; তাহলে মাদরাসার সর্বসম্মত কানুনের খেলাফ ইত্যাদি ব্যাপারগুলোতে আমরা কিভাবে তার মুখালাফাত করবো!' উত্তরে হারদূয়ীর হযরত বলেছিলেন, মুখালাফাত না কারো, মুওয়াফাকাত কি ভী ইজাযত নেহী! কিউঁকে লা ত্বাআতা লিমাখলূকিন্ ...। (বিরোধিতা করবে না, তবে একমত হওয়ারও অনুমতি নেই। কেননা স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য নেই)

অনুরূপভাবে মুফতী সাহেব আলাদাভাবে পরামর্শ করলে তাকে তিনি বলেন, আপনি চলে গেলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? তখন মুফতী সাহেব বলেন, আমি চলে গেলেও সমাধানের সম্ভাবনা দেখি না। কারণ সমস্যা মূলত কমিটি সঙ্গে, আমার সঙ্গে নয়। আমি চলে গেলে কমিটিরা তো আছে! তখন হযরত বললেন, এমনটি হলে যাওয়ার দরকার নেই।

শাইখ রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক কমিটি ভেঙে দেয়ার প্রচেষ্টা এবং এই প্রেক্ষিতে শাইখ রহিমাহুল্লাহকে সাময়িকভাবে মাদরাসায় না-আসার অনুরোধ

অতঃপর শাইখ রহিমাহুল্লাহর রাহমানিয়ায় পুনঃআগমনের ৩ মাস পর ০৬/০৫/২০০০ খ্রিস্টাব্দে বিকেল বেলা শাইখ রহিমাহুল্লাহ বছিলার মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব রহ.-সহ বেশকিছু দলীয় ও স্থানীয় লোকজনকে নিয়ে হাউজিংয়ের মালিক ও মাদরাসার জমিদাতা মরহুম হাজী নূর হোসেন সাহেবের নিকট আসেন এবং তাকে মাদরাসাটি দুই ভাগে ভাগ করে দেয়ার প্রস্তাব করেন। জবাবে হাজী নূর হোসেন সাহেব বলেন, হুযূর! আল্লাহর ওয়াস্তে এই কাজ করবেন না! আপনি গাছটিকে কেটে ফেলবেন না; গাছটা বেঁচে থাকুক, ফল যার নসীবে থাকবে সে-ই ভোগ করুক।" (উল্লেখ্য এই কথোপকথনের সময় মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম আল-মাসউদ সাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।) হাজী নূর হোসেন সাহেবের কাছ থেকে ইতিবাচক জবাব না পেয়ে শাইখ রহিমাহুল্লাহ উল্লিখিত লোকজনসহ মাদরাসার গেটে আসেন। ইতোমধ্যে সংবাদ পেয়ে পরিচালনা কমিটির কিছু সদস্যও উপস্থিত হন এবং গেট ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়। ফলে তারা আর প্রবেশ করতে পারেননি। অগত্যা শাইখ রহিমাহুল্লাহ সাতমসজিদ চত্বরে একটি প্রতিবাদ সভা করে প্রস্থান করেন। অতঃপর এই প্রেক্ষিতে শাইখ রহিমাহুল্লাহকে দুজন শীর্ষ আলেমের মাধ্যমে সাময়িকভাবে মাদরাসায় না-আসার অনুরোধ জানানো হয়। (এর বিবরণ সামনে আসছে।)

পঞ্চম পদক্ষেপ: সংকট নিরসনে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান করত শীর্ষ উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে মজলিসে শূরা নবায়ন

এই পরিস্থিতিতে পূর্ব থেকে গঠিত জামিআর "মজলিসে শূরা"য় দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামকে অন্তর্ভুক্ত করে মজলিসে শূরাকে সম্প্রসারিত ও সক্রিয় করা হয়। এই সম্প্রসারণ ও সক্রিয় করণের উদ্দেশ্য ছিল, চলমান সংকটটির যেন সুন্দর সুরাহা হয় এবং যে কোন রকমের সীমালংঘন থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখা যায়। মজলিসে শূরার সদস্যগণ ছিলেন–

হযরতুল আল্লাম মাওলানা আহমদ শফী সাহেব রহ.
হযরতুল আল্লাম শাইখ নূরুদ্দীন গহরপুরী সাহেব রহ.
হযরতুল আল্লাম মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব রহ.
হযরতুল আল্লাম মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব দা.বা.
হযরতুল আল্লাম মাওলানা নূর হোসেন কাসেমী সাহেব রহ.
হযরতুল আল্লাম মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস সাহেব দা.বা.
হযরতুল আল্লাম মুফতী মিজানুর রহমান সাঈদ সাহেব দা.বা.

এ ব্যাপারে ২২/০৫/২০০০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশন দেখুন–

"(২) জামিআর বর্তমান পরিস্থিতি ও সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা হয়। সম্মানিত সদস্যগণ ও জিম্মাদার উস্তাদগণ এ ব্যাপারে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়–

(ক) জামিআ রাহমানিয়ার বর্তমান সমস্যার সমাধান এর দায়িত্ব জামিআর নবগঠিত মজলিসে শূরার উপর ন্যস্ত করা হল। এ ব্যাপারে মজলিসে শূরা যে সিদ্ধান্ত দিবে উহাই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। জামিআর পরিচালনা কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকলে উহা মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিবে। এ মর্মে আরও প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, জনাব হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন গহরপুরী ছাহেব (দা.বা.) সফর থেকে ফিরলে যত শীঘ্র সম্ভব মজলিসে শূরার অধিবেশন আহ্বান করা হইবে।

(খ) হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক ছাহেব (দা.বা.) কে পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে লিখিতভাবে অনুরোধ জানান হবে যে, তিনি যেন মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত দেয়ার আগ পর্যন্ত মেহেরবানী করে জামিআ রাহমানিয়ায় আগমন করা এবং দরস দান করা থেকে বিরত থাকেন।
(গ) জামিআর নবগঠিত মজলিসে শূরার ঢাকাস্থ দুজন শীর্ষস্থানীয় আলেম ও মুরুব্বী জনাব হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান ছাহেব ও জনাব মাওলানা মাহমুদুল হাসান ছাহেব এর নিকট অনুরোধ জানান হইবে যে, তাঁহারা যেন জামিআ রাহমানিয়ার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে জনাব হযরত মাওলানা আজিজুল হক ছাহেবকে মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত জামিআতে আগমন এবং দরস দান থেকে বিরত থাকার জন্য সুফারিশ করেন।" [কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশন: অধিবেশন-৯৯, পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯]

ষষ্ঠ পদক্ষেপ: মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব ও মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবের মধ্যস্ততায় শাইখ রহিমাহুল্লাহর জামিআ রাহমানিয়ায় (৩য় বার) পুনঃনিয়োগ

অতঃপর উল্লিখিত রেজুলেশনের "২-এর গ" সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের মহাপরিচালক মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব দা.বা. এবং যাত্রাবাড়ি মাদরাসার মুহতামিম আল্লামা মাহমুদুল হাসান দা.বা.-এর নিকট বিষয়টি পেশ করা হলে তারা উভয়ে আলোচনা-পর্যালোচনাপূর্বক পরিচালনা কমিটির নিকট শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেব রহিমাহুল্লাহকে পুনরায় শুধু বুখারী শরীফের দরস প্রদানের সুযোগ প্রদানের অনুরোধ জানান। পরিচালনা কমিটি উল্লিখিত দুজন শীর্ষস্থানীয় আলেমের অনুরোধ রক্ষা করেন এবং শাইখুল হাদীস রহিমাহুল্লাহকে ৩য় বারের মতো দরস প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং শাইখ নিয়মিত দরস প্রদান করতে থাকেন এবং পরিস্থিতিও কিছুটা শান্ত ও স্বাভাবিক হয়। এভাবে চলে যায় ১ মাস ৮ দিন।

শাইখ রহিমাহুল্লাহর পক্ষে রাতের আঁধারে কিছু ছাত্রের মাদরাসা দখলের অপচেষ্টা

অতঃপর ০১/০৭/২০০০ খ্রিস্টাব্দের দিবাগত রাত ৩টার দিকে তৎকালীন ছাত্রসংসদের সভাপতি জামিল আহমদ প্রমুখের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে এবং কয়েকজন শিক্ষকের ইন্ধনে আনুমানিক ৩৫/৪০জন ছাত্র লাঠিসোটা, দা-চাকু প্রভৃতি ব্যবহার করে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মাদরাসা দখলের অপচেষ্টা চালায়। এ সময় তারা দফতরী জাকির হোসেনকে মারধর করে দফতর ও টেলিফোন লাইন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। যে সকল উস্তাদ-ছাত্রের তরফ থেকে প্রতিরোধ সৃষ্টি হতে পারে তাদের কামরাগুলো বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে দেয়। বিশেষত ফাতাওয়া বিভাগের ভেতরে জামিআর নায়েবে মুফতী মাওলানা সাঈদ আহমাদ সাহেবসহ সকল ছাত্রকে তালাবদ্ধ করে রাখে। মাওলানা উবাইদুল্লাহ হাজারী সাহেবকে দোতলার একটি কামরায় তালাবদ্ধ করে রাখে। চারতলার বিশাল হলরুমে ছাত্রদেরকে ভেতরে রেখে সকল গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে তাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণকারী ছাত্রদেরকে টয়লেটে ও বিভিন্ন কামরায় আবদ্ধ করে টর্চার চালায় এবং সাধারণ ছাত্র-শিক্ষকদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে দেয়। দখলদাররা লাঠিসোটা হাতে নিয়ে প্রতিটি তলার সিঁড়ি, করিডোর, বারান্দা ও ছাদে টহল দিতে থাকে এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে পুরো মাদরাসা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়।

এ সময় তারা ছাত্রদের মধ্যে চারদফা দাবী সংবলিত লিফলেট বিতরণ করে। তাদের দাবীগুলো ছিল এরকম- (ক) এখন থেকে এই মাদরাসা শাইখুল হাদীস সাহেবের নেতৃত্বে ও পূর্ণ কর্তৃত্বে পরিচালিত হবে। (খ) পরিচালনা কমিটি ভেঙে দিতে হবে। (গ) মুফতী মনসূরুল হক সাহেব এবং মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবকে বহিষ্কার করতে হবে। (ঘ) ইতোপূর্বে রাজনীতি-সংশ্লিষ্টতার কারণে যাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তাদের বহিষ্কারাদেশ বাতিল করে সকলকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

এই অভ্যুত্থানের কারণে কিছু কিছু ছাত্র-শিক্ষক রাত তিনটা থেকে সকাল প্রায় ৮.০০ পর্যন্ত উযূ-ইস্তিঞ্জার সুযোগ পায়নি। ফলে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে চরম দুর্ভোগের শিকার হয়। এমনিভাবে অভ্যুত্থান চলাকালীন তারা বাইরে থেকেও কোন শিক্ষককে মাদরাসায় প্রবেশ করতে দেয়নি। ফজরের পর মাদরাসার অন্যতম জমিদাতা ও ওয়াকিফ মরহুম হাজী মুহাম্মদ আলী সাহেব মাদরাসার সামনে আসলে তাকেও ভেতরে এনে আটকে রাখা হয় এবং মাদরাসার গেটে আগত অন্যান্য শিক্ষকদেরকেও হুমকি-ধমকি দিয়ে ফিরিয়ে দেয়া হয়। অপরদিকে দখলদাররা কিছু ব্যক্তিবর্গ যথা জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা উবাইদুল হক ছাহেব রহিমাহুল্লাহ এবং মারকাজুল ইসলামীর চেয়ারম্যান মুফতী শহীদুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাহায্য চায় এবং ঢাকার কিছু মাদরাসা উদাহরণত লালবাগ-লালমাটিয়া মাদরাসার ছাত্রদেরকে তাদের সহযোগিতায় আসতে বলে। অনুরূপভাবে শাইখ রহিমাহুল্লাহকে তাঁর পক্ষে মাদরাসা নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়েছে মর্মে সংবাদ পাঠায় এবং দ্রুত মাদরাসায় তাশরীফ আনতে বলে। শোনা গেছে, শাইখ রহিমাহুল্লাহ মুহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত চলেও এসেছিলেন! এই পরিস্থিতিতে মাদরাসার ভেতরে আটক হাজী মুহাম্মদ আলী সাহেব কোনওভাবে তার ভাই মরহুম হাজী নূর হোসেন সাহেবকে মাদরাসা বেদখলের সংবাদ পাঠান। সংবাদ পেয়ে মাদরাসার জমিদাতা এবং আলী-নূর রিয়েল এস্টেটের অন্যতম মালিক মরহুম হাজী নূর হোসেন সাহেব মাদরাসার গেটে উপস্থিত হন। তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে না দেয়ায় তিনি গ্রিল টপকে বর্তমান হাউজের দিক দিয়ে সাতমসজিদের সীমানায় প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকেই তার লাইসেন্স করা পিস্তলটি হাতে নিয়ে দরাজ গলায় তার মতো করে হুমকি দিতে থাকেন। তার এই হম্বিতম্বিতে দখলদাররা আতংকিত হয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দেয়। কিছু দখলদার দোতলার বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে এবং কিছু দখলদার গাছ বেয়ে নিচে নেমে যায় এবং মাদরাসার উত্তর দিক দিয়ে পালাতে থাকে। পালাতে না পারা দখলদাররা নিরুপায় হয়ে মাদরাসার ছাদে ও বিভিন্ন টয়লেটে আত্মগোপন করে। এ সময় যেসব কামরা তালাবদ্ধ ছিল না, সেখানকার ছাত্র-শিক্ষকগণও সাহস ফিরে পায় এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলে। একপর্যায়ে রাত ৩টায় শুরু হওয়া এই অভ্যুত্থান সকাল ৮টা/সাড়ে আটটা নাগাদ ব্যর্থ হয় এবং সাধারণ ছাত্রদের হাতে ১৬ জনের মতো দখলদার ছাত্র পাকড়াও হয়। ইতোমধ্যে মাদরাসার কমিটিবৃন্দও চলে আসেন এবং ধৃতদেরকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। আটককৃত ছাত্রদের জবানবন্দীমতে এই ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সঙ্গে কয়েকজন শিক্ষকের ইন্ধন খুঁজে পাওয়ায় তাদেরকেও মাদরাসা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। উল্লেখ্য, এই ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সময় এতে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের হাতে মাদরাসায় অবস্থানরত উস্তাদগণ ও শান্তিপ্রিয় তালেবে ইলমগণ চরমভাবে নাজেহাল হন।

দুর্ভোগের শিকার শিক্ষকবৃন্দের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

মাওলানা কারী মুনীরুজ্জামান সাহেব (শিক্ষক)-এর বিবরণ:
আমি মাদরাসার নিচতলার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের একটি কামরায় অবস্থান করছিলাম। আনুমানিক রাত তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে ব্যাপারটা টের পাই। ১৬/১৭ জন ছাত্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মাদরাসা দখল করার অপচেষ্টা চালানো হয়। এদের মাথাটি ছিল তৎকালীন ছাত্রনেতা জামিল আহমাদ নাটোরী। তার সঙ্গে ছিল তাওহীদুল ইসলাম (বর্তমানে জামিআ আজিজিয়ার নায়েবে মুফতী), শফীকুল ইসলাম গাজীপুরী, আব্দুল্লাহ নাটোরী প্রমুখ। তারা বিভিন্ন কামরার বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয়। তবে দুর্বল মনে করেই হয়তো আমার কামরায় তালা লাগায়নি। আমি তাদের হাবভাবে ব্যাপারটি বুঝে ফেলি এবং কঠিন এক হুংকার দেই। ফলে তারা পিছিয়ে যায়। যাই হোক, ফজরের পর নাস্তার সময় দলখদারিত্বের অবসান ঘটে। তখন আমি একজন দখলদার আবূ বকর নাটোরীকে ধরে ফেলি। পরে ধৃতদেরকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

মাওলানা হেলালুদ্দীন আহমাদ গাজীপুরী সাহেব (শিক্ষক)-এর বিবরণ
রাত আনুমানিক তিনটার দিকে একজন ছাত্র আমাকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে এবং শাইখুল হাদীস সাহেব রহ.-এর পক্ষে কতিপয় ছাত্রের মাদরাসার নিয়ন্ত্রণ নেয়ার কথা জানায়। আমি তখন নিচতলার দক্ষিণ-পূর্ব পাশের কামরায় অবস্থান করছিলাম। কী করণীয় বুঝতে না পেরে আমি আমার বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে বসে ভাবছিলাম এবং করিডোর দিয়ে লাঠিসোটা হাতে কিছু ছাত্রের বীরদর্পে আসা-যাওয়া প্রত্যক্ষ করছিলাম। একপর্যায়ে আমি পুরো বিষয়টি বোঝার জন্য দক্ষিণ পাশের সিঁড়ি দিয়ে দফতরের উদ্দেশে দোতলায় রওয়ানা হই। দফতরে গিয়ে দেখি, টেলিফোন ঘিরে বেশ কিছু ছাত্র বসে আছে। তাদের কাছেও লাঠিসোটা ছিল। আমি তাদের সঙ্গে কোন কথা না বলে কামরায় চলে আসি। অতঃপর ফজরের কিছু পরে হাজী নূর হোসেন সাহেব মাদরাসার গেটে আসেন এবং গেট বন্ধ দেখে সাতমসজিদের বর্তমান হাউজের দিক থেকে দখলদারদের উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন রকম হুমকি দেন। ওরা ভয় পেয়ে পালাতে থাকে। কেউ কেউ দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে মাদরাসার উত্তর দিক থেকে পালিয়ে যায়। ভেতর থেকে অভ্যুত্থানবিরোধী ছাত্ররাও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এভাবে এই দখদারিত্বের অবসান ঘটে।

মুফতী সাঈদ আহমাদ সাহেব (শিক্ষক)-এর বিবরণ
আমি তখন দারুল ইফতার নেগরান (শ্রেণী-তত্ত্বাবধায়ক)। সে-সময় দারুল ইফতার কামরাটি ছিল নিচতলার মাঝামাঝি পূর্ব দিকে। আমি এই কামরাতেই ঘুমিয়ে ছিলাম। শেষ রাতের দিকে কিছু হৈ-চৈ-এর শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। উঠে দেখি, দারুল ইফতার ছাত্ররা কামরার মাঝখানে জড়ো হয়ে বসে আছে। জিজ্ঞেস করলাম, এভাবে বসে আছো কেন? বলল, বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। বললাম, কারা লাগিয়েছে? বলল, কিছু ছাত্র। জিজ্ঞেস করলাম, কেন? বলল, ওরা শাইখুল হাদীস সাহেবের পক্ষে মাদরাসা দখল করে নিয়েছে। যাই হোক, আমরা আবদ্ধ কামরায় অবস্থান করছিলাম। জানালা খোলা থাকায় করিডোর দিয়ে যাতায়াতকারী দখলদারদের আনাগোনার ধুপধাপ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। একসময় ফজরের আযান হল। সাথে থাকা ছাত্রদেরকে বললাম, করিডোরে যারা টহল দিচ্ছে তাদেরকে দরজা খুলে দিতে বলো; উযূ-ইস্তিঞ্জা করতে হবে, নামায পড়তে হবে। ছাত্ররা ওদের কয়েকজনকে ডাকাডাকি করলেও তারা সাড়া দিচ্ছিল না; বেপরোয়াভাবে চলে যাচ্ছিল। অগত্যা আমি নিজে জানালা দিয়ে একজনকে ডেকে থামালাম। বললাম, দরজা খুলে দাও। বলল, জামিল ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া খোলা যাবে না। বললাম, জামিলকে ডাকো। কিছুক্ষণ পর জামিল আসল। জিজ্ঞেস করল, কেন বের হতে চাচ্ছেন? তাকে উযূ-ইস্তিঞ্জার কথা বললাম। বলল, ঠিক আছে, শুধু উযূ-ইস্তিঞ্জার জন্যই দরজা খুলে দিচ্ছি; অন্য কিছু করার চেষ্টা করবেন না, করলেও লাভ হবে না। অতঃপর কামরা খুলে দেয়া হলে আমরা উযূ-ইস্তিঞ্জা সেরে এসে কামরাতেই নামায আদায় করলাম। ফজরের পর আনুমানিক এক-দেড় ঘণ্টা বাদে হাজী নূর হোসেন সাহেবের পদক্ষেপে অভ্যুত্থান টলে যায়।

মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেব (শিক্ষক)-এর বিবরণ:
শেষ রাতের দিকে ফজরের কাছাকাছি সময় আমার কামরায় থাকা ছাত্রদের ফিসফাস কথাবার্তা এবং বাতি জ্বালিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আমি বিষয়টি টের পাই। ইতোমধ্যে কেউ একজন এসে আমাদেরকে দোতলায় যেতে বলে এবং সেখানেই নামায হবে এবং নামাযের পর আলোচনা হবে মর্মে ঘোষণা দেয়। এ সময় আমাদেরকে একটি লিফলেট দেয়া হয়, যার মধ্যে কিছু দাবী-দাওয়া লেখা ছিল। যতটুকু মনে পড়ছে, সেই দাবীগুলোর একটা ছিল, মুফতী সাহেব ও মুমিনপুরী হুযূরকে মাদরাসা থেকে বহিষ্কার করতে হবে। এই লিফলেট দেখেই আমি পুরো পরিস্থিতি আঁচ করে নেই। অভ্যুত্থানকারীরা প্রথমে ছাত্রদেরকে চারতলায় জমায়েত করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তৎকালীন শিক্ষাসচিব মাওলানা ইবরাহীম হেলাল সাহেবের কড়া পদক্ষেপের কারণে তারা তা করতে পারেনি। অগত্যা তারা ছাত্রদেরকে দোতলায় দাওরায়ে হাদীসের কামরায় জমায়েত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল এবং কিছু ছাত্রকে সেখানে জড়ো করতে সক্ষমও হয়েছিল। আমি কামরায় থেকে যাওয়া কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে ফজর নামায আদায় করি এবং নিজেই ইমামতি করি। এই নামাযে আমি সূরায়ে বুরূজ তিলাওয়াত করেছিলাম এবং "ইন্নাল্লযীনা ফাতানুল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনাত..." পড়ার সময় অভ্যুত্থানকারীদেরকেই আয়াতের মিছদাক মনে হচ্ছিল। ফজরের পর আমি ও পার্শ্ববর্তী কামরায় অবস্থানকারী খুলনার হুযূর তিনতলায় অবস্থিত নূরানী তালীমুল কুরআন ওয়াকফ এস্টেট-এর অফিসের দিকে রওয়ানা হই। এ সময় অভ্যুত্থানকারীরা আমাদের দিকে প্রশ্নবিদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেও আমরা তা উপেক্ষা করি এবং তিনতলায় চলে যাই। অতঃপর মাওলানা ইবরাহীম হেলাল সাহেবও তিনতলায় আসেন বা তিনি আমাদের আগেই সেখানে এসেছিলেন। আমরা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় নিয়ে আলোচনা করি এবং কিছু সিদ্ধান্ত নেই। যতদূর মনে পড়ছে, একটা সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, অভ্যুত্থানকারীদেরকে কিছুতেই চারতলায় জমায়েত হতে দেয়া যাবে না। যাই হোক, কিছুক্ষণ পরে নূর হোসেন কোম্পানী সাহেবের হুংকারে অভ্যুত্থানকারীরা ভীত হয়ে পালাতে থাকে এবং অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়।

মাওলানা উবাইদুল্লাহ হাজারী সাহেব (শিক্ষক) এর বিবরণ:
ছাত্র-অভ্যুত্থানের রাতে আমি দোতলায় তৎকালীন অস্থায়ী প্রিন্সিপাল মাওলানা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী হুযূরের কামরায় শুয়ে ছিলাম। ফজরের সময় ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দরজা খুলতে না পেরে ছাত্রদেরকে ডাকাডাকি করতে থাকি। এ সময় কেউ একজন বাইরে থেকে বলল, দরজা খোলা যাবে না, ভেতরেই থাকুন; মাদরাসা এখন শাইখুল হাদীস সাহেবের দখলে। আমি তাদেরকে উযূ-ইস্তিঞ্জার কথা বলে দরজা খোলার জন্য বলি। কিন্তু তারা আমার কথায় কর্ণপাত করেনি। ফলে সকাল ৮টা পর্যন্ত ইস্তিঞ্জা-উযূ বিহীন থাকতে হয় এবং ফজর নামাযও পড়ার সুযোগ হয়নি। এ সময় আমি মোবাইলে কমিটির সদস্যদেরকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করি। অতঃপর সকাল ৭.৩০ এর দিকে কমিটির

অন্যতম সদস্য ও জমিদাতা হাজী নূর হোসেন সাহেবের পদক্ষেপে ঘটনার অবসান হয়।

৭ম পদক্ষেপ: বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে শাইখ রহিমাহুল্লাহকে পূর্ণ অব্যাহতি প্রদান

উল্লিখিত ঘটনার পরপর পরিচালনা কমিটি ঐ দিনই অধিবেশন ডাকেন এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন–

"অদ্য ২/৭/২০০০ ইং মুতাবিক ২৯ রবিউল আউয়াল ২১ হিঃ রোজ রবিবার দুপুর ১২টায় জনাব হাজী আব্দুল মালেক ছাহেব এর সভাপতিত্বে জামিআ দফতরে জামিআ পরিচালনা কমিটির এক জরুরী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। গৃহীত প্রস্তাবসমূহ–

(১) জামিআ রাহমানিয়ার সৃষ্ট জটিল সমস্যার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা হয়। উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ সমস্যা এবং সমস্যার সমাধানকল্পে বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

(ক) হযরত শাইখুল হাদীস আজীজুল হক ছাহেবকে মাদরাসা জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় পড়ানোর যে অস্থায়ী ব্যবস্থা ছিল এবং সে ব্যবস্থাকে আগামী শূরার মিটিং এ চূড়ান্ত করার যে সিদ্ধান্ত ছিল তা বিভিন্ন কারণে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যথা: হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেব কর্তৃক জামিআর কার্যকরী কমিটি ভেঙে দিয়ে জামিআর যাবতীয় ক্ষমতা দখল করা এবং জামিআর ছাত্রদের নিয়ে সর্বসম্মত কানুন ভঙ্গ করে রাজনীতিতে ব্যবহার করা এবং জামিআকে পারিবারিক প্রতিষ্ঠান বানানোর লক্ষ্যে নিজ ছেলে মাওঃ মাহফূজুল হক (শিক্ষক জামিআ) ও নিজ নাতি মাওঃ হাসান আহমাদ (শিক্ষক জামিআ) এর মাধ্যমে কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের সহযোগিতায় বারবার জামিআর সুশৃঙ্খল তালীম-তরবিয়তে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। যা খুবই দুঃখজনক এবং জামিআর জন্য অমঙ্গলজনক।

যেমন গত ৬/৫/২০০০ ইং শনিবার ঢাকার কয়েকটি মাদরাসার কয়েকশত উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র এবং বহিরাগত বেশকিছু সন্ত্রাসীদের সহযোগিতায় জামিআর ক্ষমতা দখলের অবৈধ চেষ্টা চালান।

অনুরূপভাবে ১৬/৫/২০০০ ইং মঙ্গলবার জামিআয় অবস্থান গ্রহণ করে দ্বিতীয়বার জামিআর ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালান।

অতঃপর ১/৭/২০০০ ইং শনিবার দিবাগত রাত তিনটায় তাঁর সম্মতিতে মারকাজুল ইসলামীর মাওঃ শহীদুল ইসলাম এর প্রত্যক্ষ মদদে এবং তাঁর ছেলে মাওঃ মাহফূজুল হক ও নাতি মাওঃ হাসান আহমদের নেতৃত্বে কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের সহযোগিতায় জামিআর টেলিফোন লাইনসমূহ বিচ্ছিন্ন করে সমস্ত ছাত্র-শিক্ষকদের ঘুমন্ত অবস্থায় কামরায় কামরায় তালা ঝুলায়ে দিয়ে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠিসোটার মাধ্যমে চরম আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে জামিআর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের ঘোষণা করা হয়। এবং ৪ দফা দাবী সংবলিত একটি লিফলেট বিতরণ করে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয়ার সংবাদ মারকাজুল ইসলামীর চেয়ারম্যান মাওঃ শহীদুল ইসলামকে ফোনে অবগত করিয়ে পুলিশ ইত্যাদির মাধ্যমে সহযোগিতা চায়। অনুরূপভাবে জনাব খতীব মাওঃ উবায়দুল হক ছাহেব এবং লালবাগ মাদরাসায়ও ফোন করে সহযোগিতা চায়। এবং হযরত মাওঃ আজিজুল হক শাইখুল হাদীস ছাহেবকেও ফোন করে তাদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের সংবাদ জানায়। এবং তাদের সকলকে দ্রুত জামিআয় এসে মাদরাসার নিয়ন্ত্রণ ও সার্বিক প্রশাসনিক দায়িত্বভার বুঝে নিতে বলে। এবং একথাও জানায় যে, তাদের রাজনৈতিক মিত্রগণ দ্রুত উপস্থিত না হলে তারা বেশিক্ষণ দখল ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারবে না। এবং সেক্ষেত্রে বোমা মেরে মাদরাসা উড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে। উল্লেখ্য এসব তথ্য পরবর্তীতে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র ও নেতাদের জবানবন্দী থেকে পাওয়া গেছে। বাদ ফজর জনাব হাজী মুহাম্মদ আলী ছাহেব ঘটনা জানার জন্য মাদরাসায় আসলে সন্ত্রাসী ছাত্রগণ তাকে মাদরাসার ভেতরে ঢুকিয়ে তালাবদ্ধ করে দেয়। তখন তিনি কোনভাবে নিজের ছোটভাই হাজী নূর হোসেন ছাহেবকে তাড়াতাড়ি মাদরাসায় আসার জন্য খবর দেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার বিশেষ মেহেরবানীতে হাউজিংয়ের মালিক এবং মাদরাসার কমিটির সক্রিয় সদস্য হাজী মুহাম্মদ আলী ছাহেব এবং হাজী নূর হোসেন ছাহেব-এর সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণে দখলকারীদের অনেকে পলায়ন করে এবং ১৬ জনকে আটক করা হয়। এবং মাদরাসা সম্পূর্ণভাবে পরিচালনা কমিটির নিয়ন্ত্রণে আসে।

(ক) এসব অবস্থার প্রেক্ষিতে ১১/১/২০০০ ইং তারিখের ৯৪ নং অধিবেশনে শাইখুল হাদীস মাওলানা আজীজুল হক ছাহেবকে তালীম-তরবিয়তসহ সকল দায়িত্ব থেকে যে অবসরদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল অদ্যকার অধিবেশনে তা চূড়ান্ত করার সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(খ) মাওঃ মাহফূজুল হক ছাহেব ও মাওঃ হাসান আহমদকে অদ্য ২/৭/২০০০ ইং তারিখ হতে মাদরাসায় তালীম-তরবিয়তের সকল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো।

(গ) সন্ত্রাসী তৎপরতায় এবং অবৈধভাবে জামিআর নিয়ন্ত্রণগ্রহণে জড়িত সকল ছাত্রদেরকে পলাতক বা ধৃত জামিআ থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আরও প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, নেতৃত্ব দানকারী এবং উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এবং যেসব সন্ত্রাসী ছাত্রগণ হাতেনাতে ধরা পড়েছে তাদেরকে পুলিশের হাতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সোপর্দ করা হবে।

(ঘ) এসব ঘটনা মজলিসে শূরাকে অবহিত করার জন্য তাড়াতাড়ি শূরার অধিবেশন আহ্বান করার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তাদের সহযোগিতা কামনা করা হয়।" [কমিটির মিটিংয়ের রেজুলেশন: অধিবেশ-১০০, পৃষ্ঠা ৮০-৮২]। (চিত্র: পৃষ্ঠা ৩৮-৪০)

উল্লেখ্য, মাওলানা মাহফূজুল হক সাহেব এবং মাওলানা হাসান আহমাদ সাহেবকে রাতের আঁধারে শিক্ষক ও ছাত্রদেরকে যিম্মি করে মাদরাসা দখলের অপচেষ্টার দায়ে কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং এই অব্যাহতি প্রদানের দুই/একদিন পর আরেকজন শিক্ষক মাওলানা আশরাফুজ্জামান সাহেব তাদের সঙ্গে মিলিত হন। অতঃপর তারা সকলে মিলে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে মাওলানা মাহফূজুল হক সাহেব কর্তৃক পঠিত ও লিখিত বিবৃতিতে মুফতী মনসূরুল হক সাহেবকে [যিনি মাওলানা মাহফূজুল হক সাহেবের বহু কিতাবের শিক্ষকও বটে] "সনদবিহীন ও নামধারী" মুফতী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যা পরের দিন বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অথচ তাদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্তটি নিয়েছিল মাদরাসার পরিচালনা কমিটি এবং তা ছিল মাদরাসা দখলের অভ্যুত্থানের নিমিত্তে পরিকল্পনা ও পরিচালনার প্রমাণিত অভিযোগের ভিত্তিতে।

অষ্টম পদক্ষেপ: ছাত্র-অভ্যুত্থানের ১১ দিন পর সংকট নিরসনে দুই পক্ষের সকলকে নিয়ে মজলিসে শূরার অধিবেশন

উল্লিখিত ১০০ নং অধিবেশনের "১-এর ঘ" সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংকট নিরসনে মজলিসে শূরার অধিবেশন ডাকা হয় এবং রাত্রিকালীন ব্যর্থ অভ্যুত্থানের ১১ দিন পর ১৩/৭/২০০০ খ্রিস্টাব্দে মজলিসে শুরার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের রেজুলেশনটি দেখুন–

"মজলিসে শুরা
অধিবেশন-২
হযরত মাওলানা মুফতী আহমদ শফী ছাহেব
হযরত মাওলানা শাইখ নুরুদ্দীন ছাহেব
হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান ছাহেব
হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ছাহেব
আলহাজ্ব আব্দুল মালেক ছাহেব
আলহাজ্ব আহমদ ফজলুর রহমান ছাহেব
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী ছাহেব
শাইখুল হাদীস হযরত মাওঃ আজিজুল হক ছাহেব
হযরত মাওলানা নূর হুসাইন কাসেমী ছাহেব

অদ্য ১৩/৭/২০০০ ইং মুতাবিক ১০ রবিউস সানী ২১ হিঃ রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪:৩০ মিঃ জামিআ ভবনে জামিআ রাহমানিয়ার মজলিসে শুরার এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে মজলিস শুরু হয়। অতঃপর হযরত মাওঃ নুরুদ্দীন গহরপুরী হুযুরের প্রস্তাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে শুরা সদস্য হযরত মুফতী আব্দুর রহমান ছাহেবকে অদ্যকার অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত করা হয়। অতঃপর সভাপতি ছাহেবের ইজাযতে জামি'আর পরিচালনা কমিটির সভাপতি জনাব আলহাজ্ব আব্দুল মালেক ছাহেব উপস্থিত উলামায়ে কেরাম ও অন্যান্য সদস্যদেরকে মুবারকবাদ জানান। এবং সংক্ষেপে জামি'আর সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরে সমস্যার সমাধান কামনা করেন। সর্বপ্রথম হযরত মাওঃ নুরুদ্দীন গওহরপুরী ও জনাব মাওলানা মাহমুদুল হাসান ছাহেব শাইখুল হাদীস ছাহেবকে শুরার সদস্য হিসেবে দাওয়াত না পাওয়ার ব্যাপারে জানতে চাইলে পরিচালনা কমিটির সভাপতি জামি'আর সংবিধানের ধারা নং ৩/গ মুতাবিক সদস্যপদ থাকে না বলে মনে করে দাওয়াত না দেওয়ার কারণ দর্শান। অবশেষে উপস্থিত শুরার সদস্যগণ তা বুঝার ভুল বলে আখ্যায়িত করেন। অতঃপর হযরত শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক ছাহেব মজলিসে শুরার সদস্য হিসেবে দাওয়াত না পাওয়ার উপর দুঃখ প্রকাশ করে শুরার সভাপতি ছাহেব রেজুলেশন পাশ করেন। এরপর জামি'আর সংকট নিরসন এবং সার্বিক কল্যাণের জন্য শুরার সভাপতি ছাহেব সর্বপ্রথম হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ছাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সমস্যা নিরসনের সঠিক রাস্তার প্রতি দিকনির্দেশনা ও মূল্যবান পরামর্শ পেশ করার জন্য দাওয়াত পেশ করেন। হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ছাহেব তার বক্তব্যে ইতিপূর্বে তিনি যেসব চেষ্টা চালিয়েছেন তা উপস্থাপন করে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, জামি'আর সার্বিক কল্যাণের জন্য আমার পরামর্শ হল, পূর্বের ন্যায় হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেবসহ সকলে মিলে কাজ করা এবং সর্বদা জামি'আর কল্যাণ কামনা করা। অতএব সকলকে মিলিয়ে কাজ করার কোনো পন্থা বের করার উপর তিনি জোর তাকীদ দেন।

অতঃপর সদরে মজলিস এ পর্যায়ে জামি'আর বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা হিফজুর রহমান ছাহেবকে জামি'আর মূল সমস্যা ও তার সমাধানের কি রাস্তা হতে পারে এবং তার সমাধানের উপর আলোকপাত করার দাওয়াত দেন। জনাব মাওঃ হিফজুর রহমান ছাহেব তার বক্তব্যে হযরত শাইখুল হাদীস মাওঃ আজিজুল হক ছাহেব ইসলামী ঐক্যজোট নিয়ে বিরোধী জোটের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত স্বয়ং শাইখুল হাদীস ছাহেব কর্তৃক গৃহীত ও সর্বসম্মত কানুন বিরোধী যেসব কাজ হয়েছে এবং সেসব কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেবকে জামি'আর পৃষ্ঠপোষক হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন গওহরপুরীসহ জামি'আর সিনিয়র আসাতিযায়ে কেরাম ও পরিচালনা কমিটি এবং বিভিন্ন মুরুব্বীগণের মাধ্যমে বারবার দরখাস্ত ও অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু সকল চেষ্টা তদবীর নিষ্ফল হয়েছে— এ মর্মে তিনি বিস্তারিত বর্ণনা দেন। এবং হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেব এর সাথে জামি'আ কর্তৃপক্ষের মূল দ্বন্দ্ব হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেব কর্তৃক গৃহীত ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ এ ব্যাপারে বারবার কানুন ভঙ্গ করা এবং ছাত্ররাজনীতির ব্যাপারে তাঁর সর্বশেষ দৃষ্টিভঙ্গী জামি'আর সর্বসম্মত কানুনের বিরুদ্ধে হওয়ায় সমাধানের রাস্তার ব্যাপারে তিনি নৈরাশ্য প্রকাশ করেন এবং এ ব্যাপারে শুরার মুরুব্বীদের পক্ষ থেকে সুষ্ঠু ফায়সালা দানের আবেদন পেশ করেন।

এরপর এ পর্যায়ে জনাব সদরে মজলিস ছাহেব জামি'আর হিতাকাঙ্ক্ষী ও পরিচালনা কমিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যথা জামি'আর জন্য জমিদাতাদের পক্ষে হাজী মুহাম্মদ আলী ছাহেব, পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী হাজী আহমদ ফজলুর রহমান ছাহেব এবং নূরানী ওয়াকফ এস্টেটের মুতাওয়াল্লী ও জামি'আ পরিচালনা কমিটির সভাপতি জনাব হাজী আব্দুল মালেক ছাহেব এবং কমিটির বিশিষ্ট সদস্য জনাব শাহ মুহাম্মাদ নুরুল গনী ছাহেব এবং জামি'আর ছাত্র অভিভাবকদের পক্ষ থেকে কমিটির সদস্য জনাব এয়ার কমোডর (অব.) কামালুদ্দীন ছাহেবদেরকে জামিয়ার বর্তমান সঙ্কট নিরসনের উপর বক্তব্য পেশ করার দাওয়াত দেন। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই তাদের বক্তব্যে হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেব কর্তৃক জামি'আর ছাত্রদেরকে ব্যাপকভাবে রাজনীতিতে ব্যবহার করা এবং এ ব্যাপারে জামি'আর সর্বসম্মত কানুন ভঙ্গ করা এবং জামি'আর ক্ষমতাদখল প্রচেষ্টাকে মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। এবং এই কারণে মাদ্রাসায় বারংবার অচলাবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। এবং মজলিসে শুরার পক্ষ থেকে যে কোনো সমাধান দেওয়া হলে তা মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

এরপর জনাব সদরে মজলিস ছাহেব জামি'আ সুবহানিয়ার মুহতামিম হযরত মাওলানা নূর হুসাইন কাসেমী ছাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ পেশ করার দাওয়াত দেন। জনাব মাওঃ নূর হুসাইন কাসেমী ছাহেব তাঁর সারগর্ভ বয়ানের মধ্যে হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেব এর ব্যক্তিচরিত্রের প্রশংসা করেন। তারপর তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, আমার ধারণা হচ্ছে যে, হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেব এসব ব্যাপারে অন্যদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছেন এবং পরিচালিত হচ্ছেন। এ অবস্থা থেকে উনাকে উদ্ধার করতে পারলে উনার নিজের, দ্বীনের এবং জামি'আ রাহমানিয়ার কল্যাণ হবে। আর যদি উনাকে এ অবস্থা থেকে (খোদা না করুন) উদ্ধার না করা যায় তাহলে জামি'আর এবং দ্বীনের অনেক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে। সুতরাং সকলে মিলে উনাকে এই অবস্থা থেকে বের করার ফিকির করা দরকার। তারপর সদরে মজলিস ছাহেব জনাব হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন গওহরপুরী ছাহেব এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হযরত গওহরপুরী ছাহেব তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন যে, জামি'আর মজলিসে শুরার মধ্যে আরও উলামা সদস্য বৃদ্ধি করে শুরাকে শক্তিশালী করতে হবে। এবং শুরার যে কোন ফায়সালা কমিটিওয়ালাদের মেনে নিতে হবে। এবং সকলে মিলে চেষ্টা করতে হবে যাতে করে জামি'আকে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া যায়। জনাব গওহরপুরী ছাহেব এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে জামি'আ সুবহানিয়ার মুহতামিম হযরত মাওঃ নূর হুসাইন কাসেমীও জামি'আ রাহমানিয়ার মুহতামিম হযরত মাওঃ হিফজুর রহমান ছাহেব ও ফরিদাবাদ মাদরাসার মুহতামিম হযরত মাওঃ আব্দুল কুদ্দুস ছাহেবকে সর্বসম্মতিক্রমে জামি'আর মজলিসে শুরার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

এরপর সদরে মজলিস ছাহেব হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক হযরত আল্লামা আহমদ শফী ছাহেবকে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করার জন্য দাওয়াত দেন। হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক ছাহেব বলেন যে, পরিস্থিতি জটিল হয়ে গেছে। সুরাহা কঠিন মনে হচ্ছে। আমরা দারুল উলুম দেওবন্দের আকাবিরদের মধ্যে এ ধরণের রাজনীতি দেখি নাই। তাঁরা ছাত্র নিয়ে রাজনীতি করেন নাই। জামি'আ রাহমানিয়া একটি শিক্ষালয়। ছাত্র রাজনীতি এর জন্য মারাত্মক অবনতি, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বড় কারণ। তবে আমরা সকলে মিলে জামি'আকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে দেখতে পারি। আল্লাহ চাহে তো সুরাহা হয়ে যাবে। নচেৎ আমরা চেষ্টা করার সাওয়াবের অধিকারী হব এবং তাতে জামি'আরও ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ।

দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনা হওয়ার পর এবং উপস্থিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য শ্রবণের পর হযরত সদরে মজলিস ছাহেব তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। এবং সকলের উপস্থিতিতে বলেন, সকলে মুনাসিব মনে করলে এটাকে অদ্যকার মজলিসের ফায়সালা মানতে পারেন।

অতঃপর তিনি সাহাবা (রাযি.) এর যুগে জঙ্গে সিফফীনের পরে তাঁদের উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতার জন্য যে ওয়াকেয়ায়ে তাহকীম হয়েছিল তার ব্যাপারে সঠিক ঘটনা বর্ণনা করেন এবং বর্তমান জামিআর উভয়পক্ষের মতানৈক্যকে হযরত আলী রা. ও হযরত মুআবিয়া রা. এর মতানৈক্যের সাথে তুলনা করে এ মতানৈক্য দূর করার মহাপবিত্র কাজে অংশ নেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এবং উক্ত সঙ্কটের মূল কারণ হিসেবে সকলের বক্তব্য সারসংক্ষেপের উপর বিবেচনা করেন। এবং জামিআকে তার পূর্বের অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং উভয়ের মধ্যে সমঝোতার গুরুত্বের উপর আলোচনা রাখেন। এবং সকলকে দারুল উলুম দেওবন্দের নীতি আদর্শের উপর চলার জন্য আহ্বান জানান। অতঃপর জামিআর বর্তমান সঙ্কট দূরীকরণের লক্ষ্যে "তাহকীমের" মত কিছু সময় নিয়ে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা করার জন্য নিম্নের সিদ্ধান্তাবলী গ্রহণ করেন–

ক. উভয়পক্ষ বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, প্রত্যেক পক্ষ সে অবস্থার উপর থাকবে। কেউ কারোর বিরুদ্ধে নতুনভাবে কোনো পদক্ষেপ নিবে না। এবং কোনো প্রকার কাদা ছোড়াছুড়ি করবে না।

খ. জামিআর সঙ্কট নিরসনকল্পে জামিআর মজলিসে শুরা থেকে বিশিষ্ট উলামাদেরকে নিয়ে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাবকমিটি গঠন করা হোক। যার সদস্য হবেন–

১. হযরত মাওঃ নুরুদ্দীন গহরপুরী ছাহেব

২. হযরত মাওলানা আহমদ শফী ছাহেব

৩. হযরত মাওঃ নূর হুসাইন কাসেমী ছাহেব

৪. হযরত মাওঃ মাহমুদুল হাসান ছাহেব

৫. হযরত মাওঃ মুফতী আব্দুর রহমান ছাহেব

উক্ত সাবকমিটি উভয়পক্ষের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাবেন এবং সমস্যা চিহ্নিত করে উহার সমাধানের রাস্তা বের করতে চেষ্টা করবেন।

সদরে মজলিস ছাহেব প্রস্তাব রাখেন যে, উক্ত সাবকমিটির আহ্বায়ক মাওঃ নূর হুসাইন কাসেমী থাকবেন।

গ. এ উপলক্ষে আগামী আগস্ট মাসের ১৩ তারিখে জামিআ রাহমানিয়ার ভবনে উক্ত সাবকমিটির একটি বৈঠক হওয়ার প্রস্তাব গৃহিত হয়।

ঘ. উক্ত সাবকমিটি উভয় পক্ষের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্তের পর্যায়ে পৌছলে মজলিসে শুরার পূর্ণাঙ্গ বৈঠক আহ্বান করা হবে এবং সেই সিদ্ধান্তকে লিখিত দলীল আকারে মজলিসে শুরা কর্তৃক চূড়ান্ত করা হবে।

জনাব সদরে মজলিস ছাহেবের উল্লিখিত মতামত সকলে সর্বান্তকরণে সমর্থন করেন এবং উহাকেই অদ্যকার মজলিসের ফায়সালা হিসেবে গ্রহণ করে নেন। তবে উপস্থিত সদস্যগণ সাবকমিটির আহ্বায়ক হিসেবে হযরত মুফতী আব্দুর রহমান ছাহেবের নাম প্রস্তাব করেন এবং জনাব নূর হুসাইন কাসেমী ছাহেবকে সহযোগী থাকার প্রস্তাব পেশ করেন। অতঃপর উহাই সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয়।

আর কোন প্রস্তাব না থাকায় সদরে মজলিস ছাহেব সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অতঃপর দু'আ ও মুনাজাতের মাধ্যমে মজলিস শেষ হয়।" (চিত্রঃ পৃষ্ঠা ৯-১৪)

উল্লেখ্য, এই রেজুলেশনের নিচে "অনুমোদিত হইল" লেখাসহ অধিবেশনের সদর তথা সভাপতি মুফতী আব্দুর রহমান সাহেবের স্বাক্ষর রয়েছে।

শাইখ রহিমাহুল্লাহর "জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া হাকিকিয়া" প্রতিষ্ঠা

সম্ভবত এই সময়ে কিংবা কিছুটা আগে-পরে শাইখ রহিমাহুল্লাহ জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার সিকি কিলোমিটার উত্তরে মোহাম্মদী হাউজিং লিমিটেডের একটি ভাড়া বাসায় এবং নূর মসজিদ ও কোবা মসজিদের সমন্বয়ে একটি নতুন মাদরাসা শুরু করেন। তিনি মাদরাসাটির নাম দেন "জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া হাকিকিয়া"। এই হাকিকিয়া শব্দটি সংযুক্ত করে বোঝানো হচ্ছিল এটিই যেন প্রকৃত জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া এবং তিনিই জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার প্রকৃত হকদার।

একটি জবাবহীন প্রশ্ন

উল্লিখিত নামকরণের ভিত্তিতে প্রশ্ন উঠে যে, শাইখ রহিমাহুল্লাহ যদি জামিআ রাহমানিয়ার প্রকৃত হকদারই হয়ে থাকবেন এবং তাঁর ধারণা অনুযায়ী জামিআর পরিচালনা কমিটি না-হক হয়ে থাকবেন তাহলে শাইখ রহিমাহুল্লাহকে যখন অব্যাহতি দেয়া হলো, তখন তিনি আইনের আশ্রয় নিলেন না কেন এবং নিজ অধিকারের উপযুক্ত প্রমাণাদি দাখিল করত পরিচালনা কমিটির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন না কেন? আইনের আশ্রয় নিলে এবং তিনি হকদার প্রমাণিত হলে একসময় না একসময় তিনি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়ই তার হক বুঝে পেতেন এবং জোরপূর্বক দখল করার প্রয়োজন হতো না! কেউ বলতে পারে, শাইখপক্ষ মামলা-মোকাদ্দমা পছন্দ করতেন না, যেমনটি মাওলানা মাহফুজুল হক সাহেব ছাত্রদের উদ্দেশে প্রদত্ত তার এক বয়ানে বলেছেন। কিন্তু বাস্তব সত্য হল, শাইখপক্ষ মামলা- মোকাদ্দমা পছন্দ করতেন না বা করেন না–এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। কারণ, ২০০১ সালে রাহমানিয়া দখলের ষষ্ঠ দিন ৮/১১/২০০১ খ্রিস্টাব্দে এবং কয়েক বছর পর তারা মুফতী মনসূরুল হক সাহেব ও মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবের নামে বোমাবাজির মামলা দায়ের করেছিল। এই বইয়ের মামলা সংক্রান্ত আলোচনায় এ ব্যাপারে প্রমাণ দেয়া হয়েছে।

নবম পদক্ষেপঃ মজলিসে শূরার পুনঃঅধিবেশন, সকলকে জুড়ে-মিলে রাখার প্রচেষ্টা এবং প্রচেষ্টা নিষ্ফল

অতঃপর মজলিসে শূরার ২য় অধিবেশনের ১ মাস পর ১৩/০৮/২০০০ খ্রিস্টাব্দে মজলিসে শূরার ৩য় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনের রেজুলেশনটি লক্ষ্য করুন–

"মজলিসে শুরা

অধিবেশন-৩

হযরত মাওঃ আহমদ শফী ছাহেব

হযরত মাওঃ নূরুদ্দীন ছাহেব
হযরত মুফতী আব্দুর রহমান ছাহেব
হযরত মাওঃ মাহমুদুল হাসান ছাহেব
হযরত মাওঃ নূর হুসাইন কাসেমী ছাহেব
হযরত মাওঃ আব্দুল কুদ্দুস ছাহেব
হযরত মাওঃ হিফজুর রহমান ছাহেব
জনাব আলহাজ্ব আব্দুল মালেক ছাহেব
জনাব আলহাজ্ব আহমদ ফজলুর রহমান ছাঃ
জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী ছাহেব

[উল্লেখ্য এই অধিবেশনে শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক ছাহেবও উপস্থিত ছিলেন।]

অদ্য ১১ জুমাদাল উলা ২১ হিঃ মুতাবিক ১৩ আগস্ট ২০০০ ইং রোজ রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরায় (ঢাকা) জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার মজলিসে শুরার এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে মজলিস শুরু হয়। জনাব মাওলানা নূর হুসাইন কাসেমী ছাহেব এর প্রস্তাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে শুরার অন্যতম সদস্য হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান ছাহেবকে অদ্যকার অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত করা হয়। গৃহিত প্রস্তাবসমূহ–

১. গত অধিবেশনের সিদ্ধান্তসমূহ পঠিত হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে উহা অনুমোদিত হয়।

২. জনাব সভাপতি ছাহেব বাদ আসর সাবকমিটির বৈঠকের আলোচনা সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করেন। যার সারমর্ম এই যে, বাদ আসর সাবকমিটির উপস্থিত সদস্যগণ শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আজিজুল ছাহেব দা.বা. এর সাথে জামিআ রাহমানিয়ার বিভিন্ন ব্যাপারে আলোচনা করেন। অতঃপর তাঁরা প্রস্তব পেশ করেন যে, মজলিসে শুরার সদস্যগণ জামিআ রাহমানিয়াকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য হযরত শাইখুল হাদীস মাওঃ আজিজুল হক ছাহেবসহ সকলকে জুড়ে মিলে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চান। তো কীভাবে এটা সম্ভব হতে পারে এ ব্যাপারে তাঁরা হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেবের মশওয়ারা জানতে চান। জবাবে শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আজিজুল হক ছাহেব বলেন, "এই পরিস্থিতিতে আমি জামিআ রাহমানিয়ায় না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জনাব সভাপতি সাহেব বলেন, তাহলে কীভাবে জামিআ রাহমানিয়া সুন্দরভাবে চলতে হতে পারে এ ব্যাপারে আপনি কিছু পরামর্শ দেন। জওয়াবে হযরত মাওঃ আজিজুল হক ছাহেব এ মুহূর্তে কোনো পরামর্শ না দিয়ে এ ব্যাপারে পরে জানাবেন বলে আশ্বাস দেন।

সাবকমিটির আলোচনার রিপোর্ট পেশ করার পর জনাব সভাপতি ছাহেব, হযরত মাওঃ আব্দুল কুদ্দুস ছাহেব, হযরত মাওঃ নূর হুসাইন কাসেমী ছাহেব, হযরত মাওঃ নূরুদ্দীন গহরপুরী ছাহেব, এবং হযরত মাওঃ আহমদ শফী ছাহেব থেকে পৃথক পৃথকভাবে মতামত জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে সম্মানিত সদস্যগণ এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনা করেন। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে শাইখুল হাদীস মাওঃ আজিজুল হক ছাহেব যেহেতু জামিআ রাহমানিয়ায় না আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এর ভিত্তিতে অদ্যকার মজলিসে শুরার সদস্যগণ উনার এই সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করেন।

৩. বিবিধ, মজলিসে শুরার পক্ষ থেকে কয়েকটি সুপারিশ।

(ক) মজলিসে শুরা ও পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ লেখার জন্য একজন অভিজ্ঞ আইনজীবী/বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে।

(খ) জামিআ রাহমানিয়ার গঠনতন্ত্র সুন্দরভাবে সাজানো দরকার। এর জন্য চার সদস্য বিশিষ্ট একটি সাবকমিটি গঠন করা হয়। যথা– হযরত মাওঃ নূর হুসাইন কাসেমী, হযরত মাওঃ আব্দুল কুদ্দুস ছাহেব, জনাব মুফতী মিজানুর রহমান ছাহেব, জনাব মুফতী মনসূরুল হক ছাহেব।

(গ) দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারের হস্তক্ষেপ চাওয়ার ব্যাপারে যে ভুল খবর পরিবেশিত হয়েছে তার প্রতিবাদ পাঠাতে হবে।" (চিত্রঃ পৃষ্ঠা ১৫-১৬)

উল্লেখ্য, এই রেজুলেশনের নিচে হযরত মাওলানা আহমদ শফী রহ.-এর স্বাক্ষর রয়েছে।

ঐক্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ৯ মাস পর মজলিসে শূরা কর্তৃক জামিআ পরিদর্শন ও সন্তোষ প্রকাশ

শীর্ষ উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে গঠিত মজলিসে শূরা কর্তৃক শাইখ রহিমাহুল্লাহকে জামিআ রাহমানিয়ায় পুনঃআগমনের প্রস্তাব পেশ এবং শাইখ রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক প্রস্তাব নাকচের পর জামিআর শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকে। অতঃপর উল্লিখিত মজলিসে শূরা তাদের ৩য় অধিবেশনের ৯ মাস ১০ দিন পর ২৪/৫/২০০১ খ্রিস্টাব্দে ৪র্থ অধিবেশনে মিলিত হন। এই অধিবেশন জামিআ রাহমানিয়ার দফতরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন হযরতুল আল্লাম আহমদ শফী সাহেব রহ. এবং অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন–

হযরতুল আল্লাম নূরুদ্দীন গহরপুরী সাহেব রহ.,
হযরতুল আল্লাম মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব রহ.,
হযরতুল আল্লাম মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস সাহেব দা.বা.
আর হযরতুল আল্লাম মাওলানা নূর হুসাইন কাসেমী সাহেব রহ. ফোনে যুক্ত হয়েছিলেন।

মজলিসে শূরা জামিআর তালীম-তরবিয়তসহ সার্বিক খোঁজ-খবর নেন এবং রিপোর্ট শুনে সন্তোষ প্রকাশ করত বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। রেজুলেশনের অংশবিশেষ লক্ষ্য করুন–

"(২) অদ্যকার অধিবেশনের সভাপতি ছাহেব জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার মুহতামিম ছাহেবকে জামিআর তালীম-তরবিয়াত এবং বর্তমান আর্থিক অবস্থার উপর আলোচনা করার জন্য বলেন। জনাব মুহতামিম ছাহেব গত বছরের বেফাকুল মাদারিস এর রিপোর্ট এবং বর্তমান বছরের তালীম-তরবিয়াতের অগ্রগতি তুলে ধরেন এবং জামিআর বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাও পেশ করেন। জামিআর তালীম-তরবিয়াত ও আর্থিক পরিস্থিতি সন্তোষজনক হওয়ায় সকল সম্মানিত সদস্য খুশী প্রকাশ করেন এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে শোকর আদায় করেন।

জনাব সভাপতি ছাহেব জামিআর তালীম-তরবিয়াতের মান আরো সুন্দর করার জন্য ৫/৭ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি মজলিসে ইলমী গঠন করার প্রস্তাব পেশ করেন, যারা মাসে একবার বৈঠক করে তালীম-তরবিয়াতের অগ্রগতির ব্যাপারে আলোচনা করবেন। প্রয়োজনীয় কানুন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন এর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং বিভিন্ন দরসে হাজির হয়ে শিক্ষকদের পড়ানোর পদ্ধতি দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় ইসলাহ ও তারমীম করবেন। তাছাড়া তারা ছাত্রদের সবক এর প্রস্তুতি এবং তাদের সবক হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে খোঁজখবর নিবেন। উপস্থিত সকল সদস্য সভাপতি ছাহেব এর এ প্রস্তাবকে স্বতস্ফূর্ত সমর্থন দান করেন।

এ প্রসঙ্গে জামিআর মুহতামিম ছাহেব জনাব সভাপতি ছাহেব এর খিদমতে জামিআর সকল আসাতিযা কেরাম এর পক্ষ হতে আবেদন পেশ করেন যে, হুযূর যখনই ঢাকায় তাশরীফ আনবেন তখন যদি জামিআতে অবস্থান করেন এবং যে কোন কিতাব থেকে বরকতস্বরূপ কিছু সবক পড়ান! এমনকি মসনবী শরীফ থেকে হতে পারে, তাহলে তালিবে ইলমের সাথে সাথে জামিআর আসাতিযাগণও উপকৃত হবেন এবং সকলের দিলী তামান্না

হবে। জনাব সভাপতি ছাহেব উক্ত আবেদন মঞ্জুর করেন।" (চিত্র: পৃষ্ঠা ১৭-১৮)

হযরতুল আল্লাম শাইখ নূরুদ্দীন গহরপুরী রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক জামিআর নিবিড় পৃষ্ঠপোষকতা

হযরতুল আল্লাম শাইখ নূরুদ্দীন গহরপুরী রহিমাহুল্লাহ ছিলেন দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী ও স্বীকৃত বুযুর্গ। জামিআ রাহমানিয়ার জমির ব্যবস্থা করাসহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই আছে তার অবিস্মরণীয় অবদান। জামিআর বার্ষিক মাহফিলে কখনও তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করতেন আবার কখনও থাকতেন প্রধান মেহমান। জামিআর বিভিন্ন প্রয়োজনে তিনি অকাতরে দানও করতেন। শীত-গ্রীষ্ম সব মওসুমেই তিনি একটা কোট/কটি পরিধান করতেন। জামিআর আর্থিক অবস্থার রিপোর্ট শুনে সেই কোটের বিভিন্ন পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকা বের করতে থাকতেন। অতঃপর বের করা সমস্ত টাকা জামিআয় দান করে যেতেন। কখনও কখনও এই দান পঞ্চাশ হাজারে গিয়ে ঠেকতো!

জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক ছাহেব রহিমাহুল্লাহর বরকতময় ছায়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর সেই সুকঠিন সময়ে সুশীতল ছায়া হয়ে এগিয়ে এলেন আল্লামা নূরুদ্দীন গহরপুরী রহিমাহুল্লাহ। আগে থেকেই তিনি বছরে দুই/এক বার বিভিন্ন উপলক্ষে জামিআয় আগমন করতেন, এবার তিনি আরও নিবিড়ভাবে যাতায়াত করতে লাগলেন। জামিআর পরিচালনা কমিটিও এই মহামূল্য সম্পদ থেকে অধিক পরিমাণে উপকৃত হওয়ার মানসে তাকে জামিআর "শাইখ" ঘোষণা করলেন এবং তাঁর জন্য বুখারী শরীফের প্রথম পাঁচ পারা বরাদ্দ করলেন। অপরদিকে তিনি ছিলেন বেফাকুল মাদারিসিল কওমিয়্যার সভাপতি। সেই সুবাদে যখনই তিনি ঢাকায় আসতেন, এক-দুদিন জামিআয় অবস্থান করে বুখারী শরীফের দরস প্রদান করতেন। ছাত্রদেরকে নসীহত করতেন। আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন স্বীকৃত বুযুর্গ। তার বহু কারামত এখনও মানুষের মুখেমুখে চর্চা হয়। এমনি একটি ঘটনা। একবার তিনি জামিআর চারতলায় ছাত্রদের উদ্দেশে নসীহত প্রদান করলেন এবং দুআর আগ মুহূর্তে বললেন, "তোমরা, মিয়া আজিজুল হক ছাবের জন্য দুআ খইরো। তাইনের সামনে বড় বিফদ, বড় বিফদ!" তার মুখনিঃসৃত এই শব্দগুলো এখনও আমাদের কানে বাজছে। তবে এর মর্ম বুঝতে পেরেছি কয়েক মাস পর- যখন নূর মসজিদে পুলিশ নিহত হওয়ার ঘটনায় শাইখ গ্রেফতার হন এবং জামিআ রাহমানিয়া হাকিকিয়া মোহাম্মদী হাউজিং থেকে উঠে গিয়ে চরওয়াশপুরে স্থানান্তরিত হয়।

২০০১ সালে জামিআ বেদখল হওয়ার পর যখন টিনশেড বিল্ডিংয়ে ভাড়া বাসায় জামিআর কার্যক্রম চলতে থাকে তখনও তিনি জামিআর শাইখ পদ অলঙ্কৃত করেন এবং নিয়মিত যাতায়াত করত শিক্ষক-ছাত্রদেরকে হিম্মত যোগাতেন। একবার ছাত্রদেরকে নসীহত করতে গিয়ে বলেছিলেন, "ছিন্তা খইরো না, আল্লাহ উঁচাটারে নিচা খইরা দিবেন, আর নিচাটারে উঁচা খইরা দিবেন।" আজ একুশ বছর পর আল্লাহ তার প্রিয় বান্দার কথার লাজ রেখেছেন। নিচুটাকে উঁচু করে দিয়েছেন।

শাইখপক্ষের রাহমানিয়া দখল করে নেয়া

২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনে চারদলীয় জোট বিজয়ী হয়। চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার কিছুদিন পর ৩রা নভেম্বর বিকেল আনুমানিক তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে তিন-চার শতাধিক আর কারও কারও মতে হাজারেরও বেশি লোক আচমকা রাহমানিয়া মাদরাসায় হামলা করে। রমযানের আগ মুহূর্তে মাদরাসায় তখন বার্ষিক পরীক্ষা চলছিল। ছাত্ররা পড়াশোনায় নিমগ্ন ছিল। হামলাকারীরা মাদরাসার মেইনগেট ভেঙে, অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শনসহ বোমাবাজি করে, ছাত্র-শিক্ষকদেরকে মারধোর ও নির্যাতন করে বের করে দেয় এবং মাদরাসা দখল করে নেয়। এই হামলায় শাইখ রহিমাহুল্লার আত্মীয়-স্বজন, শাইখ রহিমাহুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত হাকীকিয়া মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক, শাইখের দলীয় লোকজন, জামাত-শিবিরকর্মী, কিছু বিএনপি নেতা-কর্মী এবং কাটাসুর-পুলপাড় ও বছিলার স্থানীয় কিছু লোক অংশগ্রহণ করে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, হামলায় অংশগ্রহণকারী জামিআ হাকিকিয়া মাদরাসার ছাত্ররা–যারা কিনা কয়েক মাস আগেই জামিআ রাহমানিয়ার শিক্ষকদের নিকট পড়াশোনা করে গিয়েছিল–প্রাক্তন শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে বেয়াদবীমূলক ও বর্বর আচরণ করেছিল!

যাদের নেতৃত্বে হামলা হয়েছিল

নাম ধরে বলতে গেলে এই হামলায় প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দিয়েছিল শাইখ রহিমাহুল্লাহর পৌত্র মুফতী শহীদুল ইসলাম, পুত্র হাফেজ মাহমূদুল হক, মাওলানা মাহফুজুল হক, মাওলানা মাহবুবুল হক, মাওলানা মামুনুল হক, দৌহিত্র হাফেজ নাঈমুল হক, স্থানীয় বিএনপি নেতা বরকতুল্লাহ, কমিশনার বাবু, মোরগ মার্কায় কমিশনার পদে নির্বাচনকারী সাঈদুল ইসলাম, পুলপাড়ের আব্দুল হাই এবং বছিলার মাওলানা আবূ তাহের গ্রুপ। আর পরোক্ষ নেতৃত্বে ছিল তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাবর, স্থানীয় বিএনপি এমপি খন্দকার মাহবুব প্রমুখ। উল্লিখিত হামলার ব্যাপারে কিছুটা বিস্তারিত জানতে হামলার শিকার ও প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন দায়িত্বশীল শিক্ষক-ছাত্রের বিবরণ পেশ করছি–

প্রত্যক্ষদর্শী দায়িত্বশীল ও উর্ধ্বতন শিক্ষকদের বিবরণ

মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের বিবরণ: (বোমাবাজি, ভাঙচুর, দাম্ভিকতা, পুলিশের নির্লিপ্ততা ইত্যাদি)

মাদরাসা দখলের আগমুহূর্তে আমি বাসায় ছিলাম। দুপুরের খানা খাচ্ছিলাম। মাদরাসার দফতর থেকে সংবাদ আসল যে, থানা থেকে লোকজন এসেছে, আপনার খোঁজ করছে। আমি দ্রুত খানা শেষ করে দফতরে আসলাম। পুলিশ আমাকে সালাম-কালাম করে বলল, মুফতী শহীদুল ইসলামসহ যারা মাদরাসা দখল করতে চাচ্ছে, তারা আজ-কালের মধ্যে মাদরাসা দখল করতে আসবে- এমন কোন তথ্য কি আপনার জানা আছে? বললাম যে, না, আজকালের মধ্যে আসবে বলে আমার জানা নেই। পুলিশ বলল, "হুযূর! মনে রাখবেন, কুকুর যখন ঘেউঘেউ করে তখন কামড় দেয় না। আর যখন কামড় দেয় তখন ঘেউঘেউ করে না; আচমকা কামড় বসিয়ে দেয়।" এই কথাবার্তার পর পুলিশের লোকজন দফতর থেকে বের হয়ে দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় গেল এবং ওয়ারলেসে সম্ভবত থানার কারও সঙ্গে সাংকেতিক ভাষায় কিছু কথা বলল, যেগুলোর মর্ম বুঝতে পারিনি। তবে ঘটনার পূর্বাপর মিলিয়ে অনুমান করি, তারা সংকেত দিয়েছিল যে, এদিকের লোকজন সম্পূর্ণ বেখবর, প্রতিরোধের আশংকা নেই, সুতরাং দখল করার পরিবেশ সম্পূর্ণ অনুকূল।

যাই হোক, এরপর পুলিশ চলে গেল আর আমি আমার কামরায় ফিরে গেলাম। মিনিট পাঁচ-দশেকের মধ্যেই জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, সাত মসজিদের মাঠের দক্ষিণ দিকে যে সংকীর্ণ গলি আছে সেখান দিয়ে প্রচুর লোকজন মাদরাসার দিকে আসছে। একজনকে ডেকে বললাম, মাদরাসার মেইনগেটসহ সব প্রবেশপথে তালা লাগিয়ে দাও। গেটগুলো লাগাতে না লাগাতেই

বিশাল সেই বাহিনী মাদরাসার গেটে হাজির। তারা এসে তালা ভেঙে হুড়মুড় করে মাদরাসার চত্বরে ঢুকে পড়ল। অতঃপর আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশে বেশকিছু বোমা ফাটাল। এ সময় বছিলার আবূ তাহের বাহাদুরী দেখানোর জন্য আমার কামরা বরাবর গাছ বেয়ে দোতলার বারান্দায় উঠে পড়ল। ওরা যখন মাদরাসায় ঢুকে পড়ল তখন নেত্রকোনা নিবাসী জুনায়েদ নামক একজন ছাত্র আমার কামরার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হামলাকারীরা লাঠি ইত্যাদি দ্বারা আমার কামরার জানালার কাচগুলো ভেঙে তছনছ করে ফেলল। আর কিছু লোক আমার কামরার দরজা ভাঙার জন্য রডজাতীয় কিছু দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করে যাচ্ছিল। [বিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত স্টিলের দরজাটি এখনো পাঁচটি ফুটোসহ সাতটি আঘাত নিয়ে সেদিনের সহিংসতার রাজস্বাক্ষী হয়ে আছে। –সংকলক] বারান্দার দিক থেকে আবূ তাহেরের কিছু গালিগালাজ ও ঔদ্ধত্বপূর্ণ কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। সে বলছিল, "মুফতী সাব কোথায়? এতো সাহস তো আজকে বাইরে আসে না কেন?" ঠিক এমন সময় বা কিছুটা আগে-পরে খবরাখবর জানার জন্য করাচী থেকে মাওলানা রফীক মাদরাসায় ফোন দিয়ে আমাকে চেয়েছিল। ফোনটি ছিল তখন মাহফূজের কাছে। পরে মাওলানা রফীকের কাছ থেকে শুনেছি, মাহফূজ তাকে বলেছিল, "এই মোবাইলে মুফতী সাহেবকে আর কোনদিন পাওয়া যাবে না।"

অবশ্য পরবর্তীকালে আবূ তাহের আকবর কমপ্লেক্সে থাকাকালীন একবার আমার সঙ্গে দেখা করে মাফ চেয়েছিল এবং জেলে যাওয়ার পর আদালতে হাজিরা দেয়ার দিন লোক মারফৎ আমাকে জানিয়েছিল যে, "আমি এবং আমার লোকজন যারা সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলাম আমরা আমাদের সেই কাজের জন্য খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত।"

এদিকে আমি বারবার থানায় যোগাযোগ করছিলাম, আর থানা থেকে বলা হচ্ছিল যে, পুলিশ তো ওখানে গেছে, আপনাদের আশপাশেই আছে। আসলে এগুলো সবই ছিল থানাওয়ালাদের বানোয়াট কথা। অতঃপর আসরের সময় মুফতী শহীদুল ইসলাম এবং আরও কিছু লোকের কথায় আমার কামরার দরজা খুলে দেয়া হল। তারা আমাকে নিরাপদে বাসায় পৌঁছে দেয়ার আশ্বাস দেয়। মুফতী শহীদুল ইসলাম ভেতরে এসে বলল, হুযূর! আমি আপনার ছাত্র। লালবাগে আপনার কাছে পড়েছি। আমি নির্বাচনে পাশ করতে পারলে শাইখুল হাদীস সাহেবকে তৎক্ষণাৎ মাদরাসা বুঝিয়ে দিতাম। কিন্তু পাশ করতে না পারায় উপর থেকে থানা পর্যন্ত ম্যানেজ করে আসতে একটু সময় লেগেছে। এখন সব জায়গা ম্যানেজ হয়ে গেছে। অতএব আজ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এটা শাইখুল হাদীস সাহেবের মাদরাসা। আপনি কমিটিকে বলে দিবেন, তারা যেন এটা নিয়ে দৌড়-ঝাঁপ না করে; করলেও কোন লাভ হবে না। আর পুলিশকে ফোন দিয়েও লাভ হবে না, কারণ আমি সব ম্যানেজ করেই এসেছি।

যা হোক, আসরের পর মাগরিবের আগ দিয়ে আমি কামরা থেকে বের হলাম। বের হয়ে দেখি, একই ধরনের প্যান্ট-গেঞ্জি পরিহিত খোঁচা-খোঁচা দাড়িবিশিষ্ট কিছু যুবক দাঁড়িয়ে আছে। এরপর কিছু লোক আমাকে চারপাশ থেকে ব্যারিকেড দিয়ে বাসায় পৌঁছে দিল। [তৎকালীন দাওরায়ে হাদীসের ছাত্র প্রত্যক্ষদর্শী আনওয়ারুল হক মোমেনশাহী বলেছেন, মুফতী সাহেব হুযূরকে যখন মাদরাসার গেট দিয়ে বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন শাইখ-দৌহিত্র নাঈমুল হক তার সাঙ্গপাঙ্গসহ "ধর্ মুফতীরে ধর্" বলে আওয়াজ তুলেছিল –সংকলক]

পরদিন সকালে আমার বাসায় প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব এসেছিলেন। আমরা পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করছি, এমন সময় শাইখুল হাদীস সাহেব রহ.-এর বড় ছেলে মাহমূদুল হক–সে লালবাগে আমার কাছে পড়েছে–এসে বলল, হুযূর! আপনার আর মুমিনপুরী হুযূরের উপর আব্বা নারাজ নন, আব্বার বিরোধ তো কমিটির সঙ্গে। সুতরাং আপনারা আসুন, আগের মতই যে সব কিতাব পড়াতেন, পড়াতে থাকুন। জবাবে বললাম, এই পরিস্থিতিতে ওখানে যাওয়ার মানসিকতা নেই। যাওয়ার আগে মাহমূদ বলল, হুযূর! পাঁচ বছর পর ক্ষমতার পালাবদল হলে আবার মাদরাসা দখলে নিবেন এমনটি ভেবে থাকলে বাদ দিন। আমরা একেক ভাই একেক দলের সঙ্গে আছি। যারাই ক্ষমতায় আসবে আমরা কেউ-না-কেউ তাদের সঙ্গে থাকবো। সুতরাং পুনর্দখলের চিন্তা ছেড়ে দিন। যাই হোক, আগের দিন বিকেলে শহীদুল ইসলাম আর পরের দিন সকালে মাহমূদ দুজনের কথা থেকেই অহঙ্কার টপকে পড়ছিল। তবে ওরা যতই বলছিল যে, কিয়ামতের আগে কিংবা আর কোনদিন ফিরে পাবেন না, আমার ততই ইয়াকীন হচ্ছিল যে, আল্লাহ অবশ্যই একদিন এই জুলুমের অবসান ঘটাবেন এবং দেখুন, আজ এতদিন পর আল্লাহ বড় আসানীর সাথে আমাদেরকে হক ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া আমাদের মুরুব্বী হারদূয়ীর হযরত রহ. আমাদেরকে কোন রকম সংঘাতে না গিয়ে আইনের আশ্রয় নিতে বলেছিলেন। এজন্য কমিটির লোকজন ও আমরা সংঘাতের পথ এড়িয়ে আইনের পথ বেছে নিয়েছিলাম। প্রবাদ আছে– "কলন্দর হার-চে গোয়্যাদ, দীদা গোয়্যাদ" অর্থাৎ আল্লাহওয়ালাগণ যা বলেন অন্তঃদৃষ্টি ও দূরদর্শিতার আলোকে বলেন"। এ ব্যাপারে আমরা হারদূয়ীর হযরত রহিমাহুল্লাহর অন্তঃদৃষ্টির চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছি।

মাওলানা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী সাহেবের বিবরণঃ (নূর হোসেন কোম্পানীকে মারধোর, মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবকে সাতমসজিদের একযুগের ইমামতিতে বাধাসৃষ্টি ইত্যাদি)

আমি তখন জামিআ রাহমানিয়ার অস্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল ছিলাম। বেফাকভুক্ত জামাআতগুলোর পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছিল। যে সব জামাআত বেফাকভুক্ত ছিল না, তাদের পরীক্ষা চলছিল। আমি কয়েক দিনের জন্য চাঁদপুরে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম। জবরদখলের দিন যোহরের পর আমি ঢাকায় পৌঁছি। মাদরাসায় এসে কিছুক্ষণ থেকে বাসায় চলে যাই। আমার বাসাটি ছিল মাদরাসার দক্ষিণে বেড়িবাঁধের দিকে যে রাস্তাটি চলে গেছে, তার মাঝামাঝি হাজী কামরুল চৌধুরীর বাড়ির দক্ষিণ পাশের বিল্ডিংয়ের দোতলায়। খানাপিনা সেরে আরাম করছিলাম। এমন সময় একজন এসে সংবাদ দিল, মাদরাসা তো হাকিকিয়াওয়ালারা দখল করে নিয়েছে। পর্যবেক্ষণের জন্য আমি বাসার ছাদে উঠলাম এবং সেখান থেকে জবরদখলকারীদের কর্মকাণ্ড দেখতে লাগলাম। আমার বাসার দিক থেকে মাদরাসার গেট পর্যন্ত পুরো রাস্তা জুড়ে শতশত মানুষ লাঠিসোটা হাতে হৈ-হল্লা করছিল। ইতোমধ্যে হাউজিংয়ের অন্যতম মালিক, মাদরাসার ওয়াকিফ হাজী নূর হোসেন সাহেব গাড়ি নিয়ে মাদরাসার গেটের দিকে অগ্রসর হন। তিনি গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথে দখলদাররা তার উপর এলোপাথারি চড়-থাপ্পর, কিল-ঘুষি বর্ষণ করতে থাকে। তিনি গাড়িতে ওঠার চেষ্টা করেও উঠতে পারেননি। তার গাড়ির উপর অনবরত ইট-পাটকেল নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। অনোন্যপায় হয়ে তিনি হাজী কামরুল চৌধুরীর বাড়ির কাছাকাছি এসে একটি গলিতে আশ্রয় নেন। আমি ছিলাম সাতমসজিদের একযুগের ইমাম-খতীব। অবস্থাদৃষ্টে ঐদিন আমি নামায পড়াতে যাইনি। মাদরাসা জবরদখল হয়েছিল শনিবার। পরের দিন ফজর থেকে নিয়ে মঙ্গলবার ফজর পর্যন্ত আমি সাতমসজিদে নামায পড়াই। মঙ্গলবারে মসজিদ কমিটি আমাকে

বলল, হুযূর! শাইখুল হাদীস সাহেব আমাদেরকে বলেছেন যে, "আমি এখানে আসার পরও সে কিভাবে নামায পড়াতে আসে!" হুযূর! আমাদের তো ইচ্ছা নেই, কিন্তু শাইখুল হাদীস সাহেব তো চারদলীয় জোটের শীর্ষ নেতা; তাঁর কথা তো রাখতে হয়! আমি বললাম, বারো বছর তো ছিলাম, আপনাদেরকে পেরেশান হতে হবে না, আমি আর আসবো না।

জবরদখলের পরের দিন সকালে একজন আমার বাসায় এসে বলল, মুফতী শহীদুল ইসলাম সাহেব আপনাকে মাদরাসার চাবিগুলো দিয়ে দিতে বলেছেন। বললাম, তোমাকে যে পাঠিয়েছে, তাকে আসতে বলো। কিছুক্ষণের মধ্যে শহীদুল ইসলাম আমার বাসায় এসে চাবি চাইল। বললাম, তোমরা তো তালা ভেঙেই আমার রুমে ঢুকেছো! তো যেভাবে রুমের তালা ভেঙেছো সেভাবে ডেক্সের তালা ভাঙলেই সব চাবি পেয়ে যাবে! অতঃপর বললাম, আমার ব্যক্তিগত সামানাগুলোর কী হবে? বলল, এসে নিয়ে যেতে পারেন। আমি তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে মাদরাসায় আসি এবং আমার সামানাগুলো সংগ্রহ করি। যাওয়ার সময় মাহমূদুল হক বলল, আব্বার সঙ্গে দেখা করে যাবেন না! বললাম, চলো। শাইখুল হাদীস সাহেব রহ. তখন দোতলার উত্তর পাশের মেহমানখানায় একাকী অবস্থান করছিলেন। সালাম দিয়ে শাইখের সামনে বসলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ বড় আসানির সাথে আমাকে জামিআ রাহমানিয়া বুঝিয়ে দিয়েছেন। কয় দিনই আর বাঁচবো! আসলে কিসমতে থাকলে গ্রহণ করতে হয়। কীভাবে যে গায়বী মদদ হয়েছে কল্পনায়ও ছিল না! কথা তো ছিল, সরকার পুলিশ-টুলিশ দিয়ে বুঝিয়ে দিবে। হঠাৎ শুনি পুলিশ ছাড়াই কেমনে কেমনে দখল হয়ে গেছে। আসলে আল্লাহ তাআলা কোন জিনিস সেধে দিলে নিতে হয়। অতঃপর হুযূর সেধে দেয়া প্রসঙ্গে দুটো ঘটনা শোনালেন। হুযূর বললেন–

ঘটনা-১: ১৯৫০ সালের দিকে একবার হজ্জে গেলাম। সে সময় সাধারণ হাজীদের জন্য একবার বাইতুল্লাহর দরজা খুলে দেয়া হতো। মনে তো চাইতো, আল্লাহর ঘরের ভেতরে প্রবেশ করি, কিন্তু হুড়োহুড়ি করে প্রবেশ করতে মনে চাচ্ছিল না। তো দরজা খোলার পর লোকজন হুড়োহুড়ি করে ভেতর প্রবেশ করছে আর আমি আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় পেছন থেকে বিরাট একটা ধাক্কা আসল। হঠাৎ দেখি আমি বাইতুল্লাহর ভিতরে!

ঘটনা-২: এক ছেলে "নিজে না খেলেও আল্লাহ কেমনে খাওয়ান" এটা দেখার জন্য খানা খাবে না বলে পণ করল। মা অনেক বুঝানোর পরও ছেলে তার সিদ্ধান্তে অটল রইল। মা তখন ছেলের জন্য ভালো ভালো খানা রান্না করে সাধাসাধি করতে লাগলো। ছেলে বিরক্ত হয়ে জঙ্গলে গিয়ে এক গাছে উঠে পড়ল। মা খানাগুলো গাছের নিচে রেখে চলে গেল যে, ক্ষুধা লাগলে একসময় অবশ্যই নেমে খেয়ে নিবে। রাতের বেলা একদল ডাকাত ডাকাতির মাল ভাগ-বাটোয়ারা করার জন্য ঐ গাছের নিচে জড়ো হল। দেখল, গাছের গোড়ায় দারুণ সব খানাপিনা সাজানো। তারা ভাবল খাবারে হয়তো বিষ মেশানো আছে। খাবার পরীক্ষার জন্য তাদের একজন লোক দরকার ছিল। হঠাৎ এক ডাকাত উপরের দিকে তাকিয়ে ছেলেটিকে দেখতে পেল। তারা ভয়ভীতি দেখিয়ে তাকে গাছ থেকে নামাল এবং পরীক্ষা করার জন্য খাবার খেতে বলল। সে খেতে চায় না দেখে ডাকাতদের সন্দেহ বেড়ে গেল। এবার তারা তাকে মারধোর করে খাওয়াতে লাগল। এমনকি খাবারের শেষ অংশও জোর করে তার মুখে ঢুকিয়ে দিল।

এই ঘটনা দুটো শুনিয়ে শাইখুল হাদীস সাহেব বললেন, আল্লাহ আমাকে এইভাবে সেধে-সেধে রাহমানিয়া বুঝিয়ে দিয়েছেন। [উল্লেখ্য, একদিকে শাইখ রহিমাহুল্লাহর এই সহজ-সরল অভিব্যক্তি এবং অপরদিকে দখলদারদের বে-লেহাজ সহিংসতা– দুটো ব্যাপার তুলনা করে সহজেই অনুমান করা যায় যে, দখলকার্যক্রমে প্রত্যক্ষ নেতৃত্বদানকারীগণ দখলপ্রক্রিয়া সম্পর্কে শাইখ রহিমাহুল্লাহকে অনেকটা অন্ধকারে রেখেছিল; পুরো প্রক্রিয়া তাঁকে অবহিত করেনি।] যাই হোক, হুযূরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমি মাদরাসা থেকে চলে আসি। আসার সময় কিছু ছাত্র যেমন আমার সঙ্গে মুসাফাহা করার চেষ্টা করেছিল, তেমনি কিছু ছাত্র কষ্টদায়ক আচরণও করেছিল। [এ প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্র আব্দুল হান্নান বলেন, মুমিনপুরী হুযূর যখন মাদরাসার গেট দিয়ে বের হচ্ছিলেন, তখন দখলদার কিছু ছাত্র হুযূরকে সরাসরি তো কিছু বলার সাহস পাচ্ছিল না, কিন্তু দলবেঁধে হুযূরের তাকিয়ায়ে কালাম (কথার-মুদ্রা) "হুঁ, হুঁ" আওয়াজ করে তাঁকে অপমান করার চেষ্টা করছিল। শাইখুল হাদীস সাহেব রহিমাহুল্লাহর উস্তাদ মুহাদ্দিস সাহেব হুযূর রহিমাহুল্লাহর সুযোগ্য পুত্রের সঙ্গে এই অবমাননাকর আচরণ দেখে আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি।]

জবরদখলের কয়েকদিন পর সাওতুল হেরা মাদরাসার মাওলানা যীনাত আলী আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, মনসূর সাহেব আর আপনার ব্যাপারটি এক নয়। আপনি মুহাদ্দিস সাহেব হুযূরের সন্তান। সবার কাছেই আপনার গ্রহণযোগ্যতা আছে। আপনি রাহমানিয়ায় চলে আসুন। আপনাকে গ্রহণ করার জন্য উনারা প্রস্তুত আছেন। তাকে বললাম, যে প্রতিষ্ঠানে ইমারাতুছ ছিবয়ান চলবে, ছাত্রদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব চলবে, অন্য কোনখানে খিদমতের সুযোগ না হলেও আমি সেখানে যাবো না।

মাওলানা কারী মুনীরুজ্জামান সাহেবের বিবরণ: (সন্ত্রাসী-সংশ্লিষ্টতা, বেয়াদবী, অস্ত্র প্রদর্শন ইত্যাদি)

আমি মাদরাসার নিচতলার দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে আমার কামরাসংলগ্ন টয়লেটে আসরের নামাযের জন্য উযূ করছিলাম। হঠাৎ অস্বাভাবিক হৈচৈ শুনতে পেলাম। শোরগোলের মধ্যেই কিছু শব্দ কানে আসল– "এটা শাইখুল হাদীস সাহেবের মাদরাসা, এটা শাইখুল হাদীস সাহেবের মাদরাসা।" তখন বুঝতে পারি, কিছু একটা ওলট-পালট হয়ে গেছে। উযূ শেষে দেখি, বহু লোক মাদরাসায় ঢুকে পড়েছে। এদের অনেককেই আমি চিনতাম। কিছু লোক তো একসময় আমাদের ছাত্র ছিল। যেমন, খোরশেদ আলম গাজীপুরী, দেলোয়ার নারায়নগঞ্জী। আর কিছু বহিরাগত হলেও ছিল চেনাজানা। অবস্থাদৃষ্টে আমি নামায পড়াতে না গিয়ে আমার কামরাতেই নামাযে দাঁড়িয়ে যাই। ইতোমধ্যে ছাত্র-শিক্ষকদেরকে জোরপূর্বক বেয়াদবীমূলক আচরণের মাধ্যমে চারতলায় জমায়েত করা হচ্ছিল। যারা এ কাজগুলো করছিল, তারা কিছুদিন আগেই আমাদের কাছ থেকে পড়াশোনা করে গিয়েছিল। এই ধারাবাহিকতায় উল্লিখিত খোরশেদ আলম গাজীপুরী আমাকে চারতলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে। আমি তখন নামায পড়ছিলাম। সে অপেক্ষা করছিল আর বলছিল, "ইচ্ছা করেই নামাযে দেরী করছে," ইত্যাদি। নামায শেষ করে আমি তাকে কঠিন এক ধমক লাগাই। ধমক খেয়ে সে আমতা আমতা করে চলে যায়। এরপর আমি চারতলায় না গিয়ে নিচতলার বোর্ডিংকক্ষের পাশে মাওলানা আহমাদুল্লাহ (শিক্ষক) সাহেবের কামরায় গিয়ে বসে থাকি। ইতোমধ্যে গুণ্ডাকিসিমের কয়েকজন অপরিচিত লোক এসে ঐ কামরায় ঢুকে পড়ে এবং আমাদের দিকে পিঠ দিয়ে বসে পড়ে। এদিকে আমার একজন মুসল্লী জনাব টুনু ভাই আমার খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য মাদরাসায় আসেন এবং খোঁজ করতে করতে মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেবের কামরায় চলে আসেন। একপর্যায়ে টুনু ভাই সেই

অপরিচিতদের একজনকে লক্ষ্য করে বললেন, কিরে পলাশ! খালি হাতেই আইছো, নাকি মাল-টাল কিছু আছে? একথা দ্বারা টুনু ভাইয়ের উদ্দেশ্য ছিল তাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে কিনা? পলাশ নামক লোকটি তখন আমাদের সামনেই পকেট থেকে পিস্তল বের করে টুনু ভাইকে দেখায়। পরে জানতে পরি, পলাশ মূলত নূরজাহান রোডের মাস্তান। এর কিছুক্ষণ পর বহিলার মাওলানা ইদরীস ওই অপরিচিত লোকদেরকে বিরিয়ানী এনে খাওয়ায়। ইতোমধ্যে মাগরিবের সময় হয়ে যায়। আমি নামায পড়াতে যাবো কিনা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। এমন সময় শাইখের বড় পুত্র হাফেজ মাহমূদুল হক এসে আমাকে বললেন, কারী সাব! আপনি যেহেতু ইমামতি করেন, নামায পড়াতে যেতে পারেন, তবে অন্য কোথাও যাবেন না, নামাযের পর এখানেই চলে আসবেন। মাগরিব নামায পড়িয়ে এসে আমি এবং বন্ধুবর (শিক্ষক) মাওলানা হেলালুদ্দীন গাজীপুরী সাহেব দুজনে মিলে আরেক বন্ধু ও শিক্ষক মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম আল-মাসউদ সাহেবের বাসায় যাই। তাঁর বাসা থেকে খানা-পিনা করে আমি ও মাওলানা হেলালুদ্দীন সাহেব মাদরাসায় ফিরে আসি। এসে দেখা হয়, শাইখুল হাদীস রহ.-এর পৌত্র মুফতী শহীদুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে। তিনি আমাকে চলমান পরিস্থিতি নিয়ে তার মতো করে বুঝানোর চেষ্টা করছিলেন। একপর্যায়ে আমি তাকে শাইখুল হাদীস সাহেব রহ.-এর আমার সঙ্গে ঘটে যাওয়া কিছু পুরনো কথা স্মৃতিচারণ করে বলি, আপনি আসলে সব ব্যাপার জানেন না, ফলে অন্যায় ও অসত্য পথ অবলম্বন করেছেন।

মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী সাহেব (শিক্ষক)-এর বিবরণ: (বোমাবাজি, শিক্ষকদের সঙ্গে বেয়াদবী ইত্যাদি)

১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে আমি জামিআ রাহমানিয়ার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। মাওলানা মাহফূজুল হক, মাওলানা আশরাফুজ্জামান আমাদের সহপাঠী। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে শবে বরাতের পর রমাযানের সপ্তাহখানেক আগে মাওলানা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী হুযূরসহ আমাদের কয়েকজনের একটি কাফেলা ইন্ডিয়ায় হারদূয়ীর হযরত মাওলানা আবরারুল হক রহ.-এর সোহবতে যাওয়ার কথা ছিল। আমাদের ভিসা-টিকেট ইত্যাদি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। মাদরাসা যেদিন বেদখল হল, সেদিন রাতেই আমাদের রওয়ানা হওয়ার তারিখ ছিল। বেদখলের দিন দুপুরের পর ভিসা-টিকেট ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্য মাদরাসায় আসি। চারতলায় যেহেতু পরীক্ষার হল ছিল এজন্য চারতলানিবাসী শিক্ষকগণ সাময়িকভাবে তিনতলায় থাকতেন। সে হিসেবে আমার সাময়িক অবস্থানও তিনতলায় ছিল। আমি ভিসা-টিকেট ও কাপড় ইত্যাদি গোছাচ্ছিলাম। ইতোমধ্যে বহু মানুষের হৈচৈ এবং ককটেল ফাটানোর শব্দ শুনতে পাই। কিছুক্ষণের মধ্যে দখলদাররা মাদরাসায় ঢুকে পড়ে এবং বিভিন্ন তলায় ছড়িয়ে পড়ে শিক্ষকদেরকে কন্ট্রোলে নেয়ার চেষ্টা করে। এ সময় একজন ছাত্র, যে কিনা একসময় আমার কাছে কিতাবও পড়েছে এবং আমি তাকে ভদ্র হিসেবেই জানতাম, সে একটা লাঠি নিয়ে আমার পেছন পেছন ঘুরঘুর করছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, শাইখ রহ. চারতলায় যে ভাষণ দিবেন, সেখানে সবাইকে জড়ো করা। আমি তাকে বললাম, আমার পেছনে লাঠি নিয়ে ঘুরঘুর করছো কেন? আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। সে বলল, আপনাকে চারতলায় যেতে হবে। [এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন বলেছেন, ছাত্রটি মীযানুর রহমান কাসেমী সাহেবকে লক্ষ্য করে বলছিল- "এই মিয়ান! উপ্রে চল!!!"] অগত্যা আমি দখলদারদের অন্যতম লিডার আমাদের সহপাঠী মাওলানা আশরাফুজ্জামানকে গিয়ে বললাম, তোমাদের এই ছাত্রকে থামাও, আমার পেছনে বেয়াদবের মতো ঘুরঘুর করছে কেন? আমি তো মাদরাসাতেই আছি; পালিয়ে যাচ্ছি না। তখন সে তাকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দেয়। যাই হোক, আসরের পর কয়েকজন ছাত্র এসে আমাকে চারতলায় নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে মাহফূজুল হক-মামুনুল হকসহ অনেককে দেখতে পেলাম। আগেই বলেছি, মাহফূজুল হক ছিল আমার সহপাঠী, আর মামুনুল হক ছিল কয়েক ক্লাস জুনিয়র। তাদেরকে সবসময় তুমি বলেই সম্বোধন করতাম। যাই হোক, চারতলায় তখন বিভিন্নজনের ভাষণ চলছিল। বক্তারা "ইন্না ফাতাহনা লাকা..." আয়াত পড়ে পড়ে বয়ান শুরু করছিল। বয়ানের মধ্যে তাদের দখল কার্যক্রমকে বদরযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করছিল এবং দখলকারীদের জন্য বদরের মতো সাওয়াবপ্রাপ্তির সুসংবাদ দিচ্ছিল। কিন্তু আমার যেহেতু রাতেই ইন্ডিয়া রওয়ানা হওয়ার কথা, এজন্য বয়ানের বিষয়বস্তু তেমন একটা মাথায় ঢুকছিল না। একপর্যায়ে আমি দখলদারদের প্রধান, মারকাজুল ইসলামীর চেয়ারম্যান মুফতী শহীদুল ইসলামের কাছে গিয়ে বললাম, আমাকে হারদূয়ী যেতে হবে, সুতরাং আমার পক্ষে আর মাদরাসায় থাকা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বললেন, "মুফতী মনসূর আপনাদের বহুত ইসলাহ করেছেন, হারদূয়ী যাওয়ার দরকার নেই, এখানেই থাকেন।" তিনি যে শব্দগুলো বলেছিলেন সে শব্দগুলোই আমি উল্লেখ করলাম। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় মনে পড়ছে, মুফতী সাহেব হুযূরকে যখন ঘেরাও দিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন দখলদার ছাত্ররা আশপাশ থেকে মারমুখী ভঙ্গিতে নানারকম কটূক্তিমূলক শ্লোগান দিচ্ছিল। যাই হোক, মুফতী শহীদুল ইসলাম সাহেবের কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে মাগরিবের সময় যখন অন্যান্য লোকজন বাইরে বেরোচ্ছিল আমিও তাদের সঙ্গে মাদরাসা থেকে বের হয়ে যাই। তবে চলমান পরিস্থিতির কারণে মুমিনপুরী হুযূর সফর বাতিল করেন। অগত্যা তাঁকে ছাড়াই আমরা কয়েকজন হারদূয়ীর উদ্দেশে রওয়ানা হই।

মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেবের বিবরণ: (শিক্ষকদের সঙ্গে বেয়াদবী)

শাইখুল হাদীস রহমাতুল্লাহি আলাইহির পক্ষে যেদিন মাদরাসা দখল হল, আমি নিচতলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের বোর্ডিংসংলগ্ন কামরায় অবস্থান করছিলাম। সে বছর আমি ছিলাম শরহে বেকায়া জামাআতের নেগরান (শ্রেণী-তত্ত্বাবধায়ক)। দুপুরের খানা খেয়ে হালকা বিশ্রাম নেয়ার পর পরীক্ষার খাতা দেখছিলাম। তখনও দু'টি পরীক্ষা রয়ে গিয়েছিল। যতদূর মনে পড়ছে, নিচতলায় তখন উস্তাদদের মধ্যে কারী মুনীরুজ্জামান সাহেব এবং আমি এই দুইজন অবস্থান করছিলাম। আসরের কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ ব্যাপক হৈ-চৈ শুনতে পাই। একজন ছাত্র দৌড়ে এসে বলল, ওরা তো মাদরাসা দখল করে নিচ্ছে। আমি আমার স্বভাব অনুযায়ী নীরব থাকি। ইতোমধ্যে দাওরায়ে হাদীসের জহিরুল ইসলামকে পেরেশান হয়ে ছুটোছুটি করতে দেখি। সম্ভবত এই পরিস্থিতিতে তাদের কী করণীয় এ ব্যাপারে আমার কাছে পরামর্শও চেয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দখলদাররা মাদরাসার ভেতরে প্রবেশ করে। ভেতরে প্রবেশ করেই তারা উস্তাদ-ছাত্রদের কাছ থেকে কামরাগুলোর চাবি নিয়ে নেয়। অতঃপর তাদেরকে কামরা থেকে বের করে সেগুলো তালাবদ্ধ করে দেয় এবং সবাইকে চারতলায় জমায়েত হওয়ার নির্দেশ দেয়। এই ধারাবাহিকতায় মাওলানা মামুনুল হকও আমার কামরায় এসে বলল, আপনার কামরার চাবি কয়টা? বললাম, আমার কাছে একটা আছে। একথার পর সে আমার কাছে থাকা চাবিটি আর চায়নি বা চক্ষুলজ্জায় চাইতে পারেনি। মাওলানা মামুনুল হক চলে যাওয়ার পর আমি কামরা থেকে বের হয়ে কারী সাহেব হুযূরের

কামরায় চলে যাই। আমরা সেখানেই জামাআতের সাথে আছর নামায আদায় করি। নামাযের পর আগে থেকেই আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু ছাত্র আমাদেরকে চারতলায় জমায়েত হতে বলে। কারী সাহেব হুযূর তাদেরকে ধমক দিয়ে বিদায় করেন। অতঃপর আরেকটি দল এসে বলে, অমুক হুযূর আপনাদেরকে সালাম বলেছেন! আরেক দল এসে বলে, অমুক হুযূর আপনাদেরকে এস্তেকবাল করে চারতলায় নিয়ে যেতে বলেছেন ইত্যাদি, ইত্যাদি। তাদের এই পীড়াপীড়িটা আমাদের জন্য খুবই অস্বস্তিকর ছিল। এভাবে কয়েক গ্রুপ আসা-যাওয়ার পর একপর্যায়ে একটা ছাত্র এসে বলল, আপনাদের পকেট চেক করতে হবে, মোবাইল ইত্যাদি আছে কিনা দেখব! একথা বলতে বলতেই সে আমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয় এবং আমার ব্যক্তিগত চাবির ছড়াটি নিয়ে নেয়। তাকে বললাম, এটা তো আমার ব্যক্তিগত চাবি, এটা নিচ্ছে কেন? সে উত্তর দিল, আজকে ব্যক্তিগত জিনিস বলতে কিছু নেই!!! অতঃপর সে চাবির ছড়াটি নিয়ে চলে যায় এবং আমরা ঐ কামরাতেই বসে থাকি। কিছুক্ষণ পর ওমর ফারুক নামে খুলনার এক ছাত্র এসে চাবির ছড়াটি দিয়ে যায় এবং বলে, চাবির ছড়াটি নেয়া ভুল হয়েছে এজন্য ফেরত পাঠানো হয়েছে। যাই হোক, একপর্যায়ে তাদের পীড়াপীড়ি সীমা ছাড়িয়ে গেলে আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে চারতলায় চলে যাই। আমাদেরকে চারতলায় নেয়ার সময় ঐ ছাত্রগুলো এমন সব আচরণ করেছিল, যেগুলো করা কোন তালেবে ইলমের জন্য একেবারেই অসমীচীন। চারতলায় তখন বিভিন্নজন ভাষণ দিচ্ছিলেন। আমি বিলকুল অস্বস্তিবোধ করছিলাম। ফলে মাগরিবের আযান হলে নামাযের বাহানায় নিচে নেমে আসি এবং সাতমসজিদে চলে যাই। সাতমসজিদে আসার পরও কিছু ছাত্র আমার পেছনে ঘুরঘুর করছিল। অতঃপর ইশার নামায আদায় করে আমি মাদরাসায় ফিরে আসি। মাদরাসায় আসার পর দেখি, আমার কামরায় "সাধারণ দখলাররা" (ছাত্র নয়) বিরিয়ানী খাচ্ছিল। বিরিয়ানী পরিবেশনের চামচ না থাকায় এক দখলদার ছাত্র আমার কাছ থেকে একটি চামচ নিয়ে তাদেরকে মেহমানদারী করে এবং পরে সেটি হারিয়ে ফেলে। যাই হোক, ছাত্রদের দুটি পরীক্ষা রয়ে যাওয়ায় আমি মাদরাসায় থেকে যাই এবং স্বাভাবিকভাবে মাদরাসা যেদিন ছুটি হওয়ার কথা ছিল সেদিন হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে মাদরাসা থেকে চলে আসি। মাদরাসায় থাকাকালীন মাওলানা হাসান আহমাদ সাহেব আমাকে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। মুরুব্বীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেবো বলে আমি তার অনুরোধ এড়িয়ে যাই। অতঃপর রমাযানের মাঝামাঝি এসে আমার সামানপত্র নিয়ে নতুন মাদরাসায় যোগদান করি।

মাওলানা উবাইদুল্লাহ হাজারী সাহেবের বিবরণঃ (বোমাবাজি, ছাত্র-অভিভাবকে মারধোর, তার টাকা-পয়সা ছিনতাই, অস্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি)

জবরদখলের আগের দিন আমি আমার ভায়রা, মোহাম্মদী হাউজিং লিমিটেডস্থ কোবা মসজিদের তৎকালীন খতীব মাওলানা মুনাওওয়ার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ময়মনসিংহে একটি মাহফিলে গিয়েছিলাম। দখলের দিন সেখান থেকে ফিরে প্রথমে আমি কোবা মসজিদে যাই। অতঃপর যোহরের নামাযের বেশ পরে সেখান থেকে রিকশাযোগে মাদরাসার উদ্দেশে রওয়ানা হই। বাঁশবাড়ি জামে মসজিদ পার হয়ে মাদরাসার উত্তর দিকে এসে রিকশা থেকে নামতেই বহু লোক একসঙ্গে চিৎকার করে উঠে, ধর্ ধর্ হাজারীরে ধর্। আত্মরক্ষার্থে আমি পার্শ্ববর্তী পুলিশের বাড়িতে প্রবেশ করে কেচিগেট লাগিয়ে দেই। এই সময় পুলিশের আহলিয়া এসে গেটে তালা লাগিয়ে দেন এবং আমাকে তার বাসার দোতলায় নিয়ে যান। অতঃপর তিনি তার স্বামী পুলিশ সাহেবকে ফোন দিয়ে আমাকে আশ্রয় দেয়ার কথা অবগত করেন। পুলিশ সাহেব তখন ডিউটিতে ছিলেন। তিনি তার আহলিয়াকে বলেন, কোন পুলিশ ছাড়া অন্য কারও কাছে তাকে ছাড়বে না এবং যে যতই অনুরোধ করুক, বলবে যে, এটা পুলিশের বাসা, তিনি বাসায় আসার আগে গেট খোলা যাবে না। এর মধ্যে মারমুখী সন্ত্রাসীরা আমাকে বের করার জন্য পুলিশের আহলিয়ার কাছে অনেক অনুরোধ করেছে কিন্তু তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত করেননি। এ সময় আমি মোবাইলে আমার আত্মীয়-স্বজন এবং শৈশবের বন্ধু পুরান ঢাকার এমপি নাসিরুদ্দীন পিন্টু সাহেবকে ব্যাপারটা জানাই এবং পুলিশের বাসার জানালা দিয়ে দখলদারদের ককটেল ফাটানো ও তাণ্ডবলীলা দেখতে থাকি। ঐদিন যোহরের পর আমার বড় ভাই মোস্তফাগঞ্জ মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব রহ. তার সন্তানদের খানা-খরচ ইত্যাদি দেয়ার জন্য মাদরাসায় এসেছিলেন। সন্ত্রাসীরা তাকেই আমি মনে করে মারধোর করে তার পাঞ্জাবী ছিড়ে ফেলে এবং তার সঙ্গে থাকা প্রায় ৬০০০/- (ছয় হাজার) টাকা ছিনিয়ে নেয়। পিন্টু সাহেব শাইখুল হাদীস সাহেবের পুত্র মাহবুবুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেন, "তোমরা শাইখুল হাদীস সাহেবকে মাদারাসা বুঝিয়ে দিয়েছো এবং সেটা তো হয়ে গেছে। কাজেই উবাইদুল্লাহ হাজারীর গায়ে কিন্তু একটা টোকাও দিবে না।" অতঃপর পিন্টু সাহেবের নির্দেশে মাহবুবুল হক নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে পুলিশের বাসা থেকে মাদরাসার দফতরে নিয়ে আসে। দফতরের উত্তর-পশ্চিম কর্নারে তখন শাইখুল হাদীস সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি, বছিলার আব্দুল মালেক সাহেব রহ. এবং তার পুত্র আবু তাহের পূর্ব দিকে মুখ করে বসা ছিলেন। আবু তাহের আমাকে দেখামাত্রই ক্ষিপ্রতার সাথে লাফ দিয়ে তার স্থান থেকে উঠে দাঁড়ায় এবং বলে ধর্ হাজারীরে! এ সময় আবু তাহেরের আব্বা আবু তাহেরকে একটি চড় দিয়ে বলেন, সাবধান! উবাইদুল্লাহরে কিছু বলবি না, ও আমার আমীর সাহেবের ছেলে। উল্লেখ্য, আমার আব্বা ছিলেন তাবলীগের মুরুব্বী এবং বিশ্ব ইজতেমার আজীবন মুয়াযযিন। ইতোমধ্যে শাইখুল হাদীস সাহেবের নাতি নাঈমুল হক এবং নায়েত সাঈদ আহমদ আমাকে দফতর থেকে বের করে নেয়ার জন্য হাত ধরে টানাটানি করতে থাকে। অথচ নাঈমুল হক একসময় আমাদের কাছে হিফজখানায় পড়েছে। এ সময় আমার এক আত্মীয় মাওলানা ফজলুল হক আমীনী সাহেবের বেয়াই হাফেজ রহমতুল্লাহ সাহেব যিনি শাইখুল হাদীস সাহেবেরও আত্মীয় ছিলেন, আমাকে কানে কানে বললেন, উবাইদুল্লাহ! তুমি কিছুতেই দফতর থেকে বের হবে না, ওরা কিন্তু তোমাকে মারধোর করবে। ইতোমধ্যে আমার আত্মীয়-স্বজনও মাদরাসায় চলে আসেন। তারা আসার পর শাইখের বড় পুত্র মাহমূদুল হক আমাকে দফতরের পূর্বপাশে অবস্থিত রাহমানী পয়গামের অফিসে নিয়ে আসলেন। এ সময় রাহমানী পয়গাম অফিসের স্টিলের আলমারী ও শেলফে আমি বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র দেখতে পাই, যেগুলো দখলের পর তারা এখানে এনে হেফাজত করেছিল। অতঃপর মাহমূদুল হক আমাকে বললেন, দেখ্ হাজারী! এতোদিন যা হওয়ার হয়ে গেছে, তুইও সব ভুলে যা, আমরাও ভুলে যাই। আর এখন থেকে তুই আমাদের সাথে কাজ করবি, মুফতী সাহেবের সঙ্গে কাজ করবি না, প্রিন্সিপ্যাল পদ ছাড়া তোর যা-যা লাগে দেবো। (উল্লেখ্য, জামিআ রাহমানিয়ার অর্থ-কালেকশনের ব্যাপারে আমার দৌড়ঝাঁপ সম্পর্কে তারা ভালোভাবেই জানতো। এজনাই তারা এই সব অবাস্তব টোপ দিয়ে আমাকে পক্ষে নেয়ার শেষ চেষ্টাটি করছিল। কিন্তু আমিও

তো পুরান ঢাকার মানুষ এবং শাইখপুত্রদের কারও কারও সঙ্গে তুই-তোকারি সম্পর্কের সুবাদে তাদেরকে ভালোভাবেই চিনতাম, ফলে ওসব কথায় চিড়ে ভিজেনি)। যাই হোক, মাহমূদুল হকের উল্লিখিত কথা শুনে আমার বোনজামাই সেনা-চিকিৎসক নিয়াজ সাহেব তাকে বললেন, আপনারা কী সব কথাবার্তা বলছেন। সে এখন বাসায় যাবে, তারপর যার সঙ্গে তার থাকতে মন চায় থাকবে; এটা তো জোরাজুরির বিষয় নয়। নিয়াজ সাহেবের একথার প্রেক্ষিতে মাহমূদুল হক বললেন, ঠিক আছে, যার সঙ্গে ইচ্ছা থাকবে, অন্তত আমাদের বিরুদ্ধে কোন কাজ করবে না এটুকু নিশ্চয়তা দিক। যাই হোক, অতঃপর আমি আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাসায় চলে আসি এবং পরদিন মুফতী সাহেব হুযূরসহ অন্যান্য মজলুম শিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের খোঁজ-খবর নেই এবং নতুন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হলে প্রথম দিন থেকেই সেখানে যোগ দেই।

বস্তুত শাইখুল হাদীস সাহেব হুযূর ছিলেন আমাদের জানের জান, প্রাণের প্রাণ। লালবাগ মাদরাসা থেকেই হুযূরকে মুহাব্বত করতাম। শাইখের পুত্র মাহবূবুল হক আমার সহপাঠী হওয়ায় শাইখের বাসায় আমার অবারিত যাতায়াত ছিল এবং আমাদের বাসার দরজাও তাদের জন্য সবসময় খোলা ছিল। কতশত বার যে শাইখের বাসায় খানা ও সাহরী খেয়েছি স্মরণ নেই! মাওলানা মাহফূজুল হকের সোয়ারীঘাট মসজিদের খতীব হওয়াও আমার সহযোগিতায় হয়েছিল। শাইখুল হাদীস সাহেবও অনেকবার আমাকে "তুই তো আমার নিজের লোক" বলে ব্যক্ত করেছেন। বাবরী মসজিদের শাহাদাতের পর শাইখের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত লংমার্চের পুরোটা সময় আমি হুযূরের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে ছিলাম এবং সাধ্য অনুযায়ী খেদমত করেছিলাম। এ সময় হুযূরের ছেলেরা হুযূরের কাছাকাছি না থাকায় তাদেরকে বকাঝকাও করেছি। কিন্তু প্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত তাঁর কিছু পদক্ষেপের কারণে, আমি নিজেই যেগুলোর প্রত্যক্ষদর্শী, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থেই হুযূরকে সমর্থন করা সম্ভব হয়নি। উদাহরণস্বরূপ হুযূর একদিন আমাকে বাসায় ডেকে নিয়ে বললেন, "উবাইদুল্লাহ! একটা কামের লাইগা তরে ডাকছি। দেখ্ তরাও ঢাকাইয়া, আমরাও ঢাকাইয়া, এক কাম কর্– কমিটিতে ঢাকাইয়াগুলারে রাইখা নোয়াখাইল্যাগুলারে বাইর করনের ফিকির কর্।" বললাম, হুযূর! আপনের কথায় সব করতে পারবো কিন্তু এই কাজটা করতে বইলেন না। আপনে যাদেরকে বের করে দেয়ার কথা বলতেছেন, মাদরাসার পেছনে তাদের কারও কারও কোটি টাকার কাছাকাছি অবদান আছে এবং সেগুলো আমার হাত হয়েই মাদরাসায় এসেছে! সুতরাং তাদেরকে কেমনে বাদ দেই!!!

এছাড়া অগণিত ছাত্র ও স্টাফ এ অবৈধ দখল, অস্ত্রবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী বিদ্যমান রয়েছে, যাদের কেউ কেউ দখলবাজদের রোষানলেরও শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন– (ছাত্র) জহিরুল ইসলাম গাজীপুরী, মাওলানা আবুল হাশেম খুলনাবী, মাওলানা আবূ সাঈদ নেত্রকোনা, মাওলানা ক্বারী ইদরীস মানিকগঞ্জী, মাওলানা আল-আমীন, মাওলানা মুহাম্মদ আলী কাসেমী, (স্টাফ) বোর্ডিং ম্যানেজার জনাব মীর হোসেন, বাবুর্চি জনাব আব্দুল মালেক, দোকান-স্টাফ জনাব আব্দুল হাই প্রমুখ। সংক্ষিপ্ততার লক্ষ্যে শুধু একজন ভুক্তভোগী ছাত্রের বক্তব্য তুলে ধরা হল–

আল-আমীন (ছাত্র)-এর বিবরণ: (সারসংক্ষেপ: ভাঙচুর, বক্তব্যে ইন্না ফাতাহনা লাকা আয়াত পাঠ, উবাইদুল্লাহ হাজারী সাহেবকে ওয়াজিবুল কতল ঘোষণা, ভাড়াটে সন্ত্রাসী ব্যবহার, নিজেরা ককটেল ফাটিয়ে মুফতী সাহেবদের নামে বিস্ফোরণ মামলা এবং ২০০৭ সালের আরেকটি মিথ্যা মামলা ইত্যাদি)

২০০১ সালে শাইখুল হাদীস সাহেবের পক্ষে মাদরাসা দখলে নেয়ার সময় আমি হেদায়াতুন্নাহু জামাআতে পড়তাম। আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা চলছিল এবং দুটো পরীক্ষা অবশিষ্ট ছিল। আমরা চারতলার হলরুমে থাকতাম। ঘটনার দিন আসরের আযানের সামান্য আগে আমি চারতলার বারান্দায় যাই। সেখান থেকে দেখতে পাই শতশত নয়, হাজার হাজার লোকজন বিভিন্ন দিক থেকে মাদরাসার দিকে ধেয়ে আসছে। সাতমসজিদের দিক থেকে মাওলানা আশরাফুজ্জামান সাহেবকে (জামিআ আজিজিয়ার শিক্ষাসচিব) অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে আসতে দেখলাম। বুঝতে পারলাম, এই পঙ্গপাল ঠেকানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দখল তো করবেই কিন্তু সংঘাত কিভাবে কমানো যায় আমার মধ্যে তখন এই চিন্তা কাজ করছিল। চারতলার গেটগুলোর চাবি যার কাছে ছিল, সে ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে কোথাও সরে গিয়েছিল। ইতোমধ্যে দখলদাররা মাদরাসায় ঢুকে পড়ে এবং বড় একটা দল চারতলার দক্ষিণের গেটে চলে আসে। গেট তালাবদ্ধ পেয়ে তারা গেট ধরে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দেয় এবং ভাঙার চেষ্টা করে। এমন সময় বছিলার মাওলানা আবূ তাহের সাহেব গেটের বাইরে থেকে আমার নাম ধরে সম্বোধন করে বললেন, গেট খুলে দাও। আমি বললাম, চাবি তো আমার কাছে নেই এবং যার কাছে চাবি তাকে দেখছি না। এদিকে আসরের আযান হয়ে গেছে। ওরা ভেতরে প্রবেশ করলে হৈ-হট্টগোলে নামায পড়ার সুযোগ পাব কিনা এই ভেবে একসাথীকে ইকামাত দিতে বললাম এবং নিজে ইমাম হয়ে গেলাম। নামাযের মধ্যেই বিভিন্ন শ্লোগান শুনে টের পেলাম ওরা গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করছে। সালাম ফিরিয়ে দেখি, তারাও আমার পেছনে ইক্তিদা করে নামায পড়ছে। আমরা নামাযে থাকায় চারতলায় তখন কোন সংঘাতের ঘটনা ঘটেনি। তবে অন্যান্য তলায় বিভিন্ন সংঘাতের সংবাদ আক্রান্তদের কাছ থেকে শুনেছি। ইতোমধ্যে মাওলানা আশরাফুজ্জামান সাহেব সামনে আসলেন। আমাদেরকে দক্ষিণমুখী হয়ে বসে যেতে বলা হলো। আমরা বসে পড়লাম। তখন থেকে বক্তব্য শুরু হলো। বক্তাদের অনেকেই তাদের বক্তব্যের শুরুতে "ইন্না ফাতাহনা লাকা..." আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেন। বক্তাদের মধ্যে ওয়াশপুরের মাওলানা সুলাইমান সাহেব, বাইতুল মুআজ্জম মসজিদের সম্ভবত জামায়াত-ঘরানার সাবেক ইমাম সাহেব, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ সাহেব, বছিলার মাওলানা আবূ তাহের সাহেব প্রমুখের বক্তব্য ছিল খুবই শ্রুতিকটূ। বাইতুল মুআজ্জমের ইমাম সাহেব তার বক্তব্যে বললেন, মুফতী মনসূর আর মাওলানা হিফজুর রহমান এ দুজন হলো বিষধর সাপ; এদেরকে সীমানা ছাড়া করতে হবে। হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ সাহেব ফতোয়া জারী করলেন, মাওলানা উবাদুল্লাহ হাজারী ওয়াজিবুল কতল, তাকে যেখানে পাওয়া যাবে হত্যা করতে হবে। এই রকম ধর-মার বক্তব্যের একপর্যায়ে ইশার নামাযের কিছুটা আগে বা পরে শাইখুল হাদীস সাহেব রহ. চারতলায় আসলেন। তখন "বাংলাদেশের উসামা, শাইখুল হাদীস আল্লামা" শ্লোগান দিয়ে তাঁকে বরণ করা হলো।

আমার জানা মতে এই ঘটনায় বিএনপির স্থানীয় এমপি খন্দকার মাহবুব সাহেবের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। আর প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল বিএনপি কমিশনার রাজু, বরকতুল্লাহর লোকজন ও আবূ তাহের সাহেবের নেতৃত্বে বছিলার স্থানীয় লোকজন। নূর হোসেন কোম্পানীকে দখলদার ছাত্রদের পাশাপাশি বরকতুল্লাহর লোকজন প্রহার করেছিল। [পরবর্তীকালে অল্পদিনের মধ্যেই রাজু ও বরকতুল্লাহ অভ্যন্তরীণ কোন্দলে প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হয়েছিল।] দখলের আগে তারা সর্বশেষ বৈঠক করেছিল নিকটস্থ আল্লাহ করিম মসজিদে। সে বৈঠকে আমার যতটুকু জানা, আবূ

তাহের সাহেবকে তার সংগঠন চালানোর জন্য মাদরাসার একটা অংশ ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সমঝোতা হয়েছিল। যদিও পরবর্তীকালে এ ওয়াদা রক্ষা করা হয়নি। দখলের পরবর্তী দিন ভোরে আমি মাদরাসার মাঝখানের সিঁড়ি দিয়ে পাঁচতলার ছাদের দিকে উঠি। পাঁচ তলার সিঁড়ির চৌকিতে (যেটাকে আমরা সাড়ে পাঁচতলা বলতাম)-গিয়ে দেখি, প্যান্ট পরিহিত অনেকগুলো যুবক, কেউ কালো গেঞ্জী পরে আর কেউ খালি গায়ে গাদাগাদি করে শুয়ে আছে। এরা কেউই মাদরাসার ছাত্র ছিল না। এরা ছিল ভাড়াটে মাস্তান। আমরা ভয়ে দ্রুত নিচে নেমে আসি। [পরবর্তী সময়ে এই মাস্তানদের একজন সপ্তাহব্যাপী সশস্ত্র পাহারাদারীর কথা স্বীকার করেছে। এখন মাশাআল্লাহ তার জীবনে অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে এবং সে মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের ভক্তও বটে। -সংকলক] অতঃপর পরের দুদিন যেহেতু আমাদের পরীক্ষা ছিল আমরা কোনরকমে পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষা দেয়ার পর ওরা আমাকে মাদরাসা থেকে বের হতে দিচ্ছিল না। কয়েকজন শিক্ষক আমাদেরকে ওখানে থেকে যাওয়ার জন্য বোঝাচ্ছিলেন। কিন্তু সার্বিক অবস্থাদৃষ্টে আমার মন থেকে যেতে সায় দিচ্ছিল না। এর অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি হলো এই- ইতোপূর্বে দখল চলাকালীন ও দখল পরবর্তী কয়েকদিন বিভিন্ন সময় আমি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছি। সেই সব বিস্ফোরণে পুরো মাদরাসা কেঁপে উঠতো। বিশেষত দখলের তৃতীয় দিন যখন আমাদের পরীক্ষা শেষ হল, ইশার নামাযের আগ মুহূর্তে প্রায় খালি মাদরাসার উত্তর দিক থেকে বিস্ফোরণের বিকট শব্দ হল। শব্দের উৎস খুঁজতে আমি উত্তর দিকের বারান্দার শেষপ্রান্ত থেকে তাকিয়ে গিয়ে দেখি, তিন তলার টয়লেট থেকে ধুয়া বেরোচ্ছে। ইতোপূর্বেও যখনই ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটেছিল বিস্ফোরণের কিছুক্ষণ পরই ওরা বলাবলি করছিল যে, এই যে মুফতী সাহেবের লোকজন ককটেল মেরে চলে গেল! আগের ওই কথাগুলো যাচাই করার জন্যই আমি বিস্ফোরণের সাথেসাথে উৎসের খোঁজে বের হয়েছিলাম। মাদরাসার টয়লেটের ভেতর থেকে ধূয়া বের হতে দেখে যা বোঝা বুঝে নিলাম। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, সতিসত্যিই তারা নিজেদের ঘটানো এই বিস্ফোরণের অভিযোগ মুফতী সাহেব ও মুমিনপুরী হুযূরের নামে চালিয়ে দিয়ে মামলা দায়ের করেছিল! যাই হোক, আমাকে ওই দিন মাদরাসা থেকে যেতে দেয়া হলো না। পরের দিন যখন বারবার পিড়াপিড়ি করলাম, তখন মাহফূজুল হক সাহেব হুযূর বললেন, ঠিক আছে, এখান থেকে সোজা বাড়িতে চলে যাবে, আশেপাশে কোথাও যাবে না। এদিকে সংবাদ পেয়েছিলাম, মুফতী সাহেব হুযূর পাশেই নূর হোসেন কোম্পানীর বিল্ডিংয়ে মাদরাসা চালু করতে চাচ্ছেন। আমি মাদরাসা থেকে বের হয়ে তাদের ভয়ে সোজা সাতমসজিদ সুপারমার্কেটের দিকে চলে গেলাম। অতঃপর ওখান থেকে রিকশা নিয়ে ঘুরপথে নূর হোসেন কোম্পানীর বিল্ডিংয়ে চলে আসলাম, যদিও সোজা পথে গেলে এক মিনিটেই পৌঁছতে পারতাম। অতঃপর আমি মুফতী সাহেব হুযূর ও মুমিনপুরী হুযূরের প্রতিষ্ঠিত নতুন মাদরাসায় ভর্তি হই এবং পড়াশোনা করতে থাকি। অতঃপর ২০০৭ সালে মুফতী মনসূরুল হক সাহেব, মাওলানা উবাইদুল্লাহ হাজারী সাহেবসহ অন্যান্যদের সঙ্গে আমার নামেও রাহমানিয়া ভবনে সশস্ত্র হামলার মামলা হয়েছে এবং ওয়ারেন্ট জারী হয়েছে। মামলায় উল্লিখিত তারিখ ও সময় মিলিয়ে দেখি, আমি সে দিন সে সময় মুহাম্মদপুরেই ছিলাম না; উস্তাদে মুহতারাম মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেব গাজীপুরের এক পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রধান নেগরান ছিলেন। উস্তাদজীর সঙ্গে যাত্রাবাড়ি-কাজলার বেফাক অফিস থেকে পরীক্ষার কাগজপত্র সংগ্রহ করে তাকে মহাখালী পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়েছিলাম। মাওলানা আবু বকর নামক একব্যক্তি (বর্তমানে জামিআ আজিজিয়ার শিক্ষক ও সাবেক ক্যাশিয়ার) এই মামলার বাদী ছিলেন।

হারদূয়ীর হযরতের নির্দেশনা। দখলদারদের মামলা দায়ের। কমিটির আইনী পদক্ষেপ। মামলার রায়। জয়-পরাজয়। উচ্ছেদ অর্ডার। উচ্ছেদ অভিযান। আপত্তি-খণ্ডন। আখেরী কালাম

মাদরাসা বেদখল হওয়ার পর হারদূয়ীর হযরত রহিমাহুল্লাহর অবস্থান ও নির্দেশনা– "নতুন জায়গায় কার্যক্রম শুরু করো, আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করো।"

এক. রাহমানিয়া বে-দখল হওয়ার পর হযরত মাওলানা আবরারুল হক হারদূয়ী রহিমাহুল্লাহকে মুফতী মনসূরুল হক সাহেব রাহমানিয়া বে-দখল হওয়ার সংবাদ জানালেন। হারদূয়ীর হযরত মুফতী সাহেবকে ধমক দিয়ে বললেন, "ক্যায়সে দখল কিয়া? তুম নে পুলিস্ কিউঁ নেহী রাক্খা? ক্যায়সে ঘুস্ গায়া? (কিভাবে দখল করল? তোমরা পুলিশ রাখোনি কেন? কিভাবে ঢুকল?) মুফতী সাহেব বললেন, "উনহনে তো সারকার কে সাথ্ ইলেকশন কিয়া, পুলিস্ তো উনকে মুওয়াফেক হ্যায়, আওর হুকুমত উনকে সাথ হ্যায়"। (উনারা তো সরকারের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করেছেন, পুলিশ তো উনাদের পক্ষে এবং সরকারও তাদের সঙ্গে।) একথা শুনে হারদূয়ীর হযরত রহিমাহুল্লাহ বললেন, "ঠিক হ্যায়, কিরায়া পর কোঈ মাকান লে লো, আওর ওহাঁ পর তামাম কাররাওয়াঈ কারো। আওর উস মাদরাসা কী ওয়াপসী কে লিয়ে কানূনী কাররাওয়াঈ কারো।" (যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন কোন বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে পুরোদস্তুর কার্যক্রম শুরু করে দাও। আর ঐ মাদরাসা ফেরৎ পাওয়ার জন্য আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করো।)

দুই. রাহমানিয়া বে-দখলের দিন রাতে রাহমানিয়ার কয়েকজন শিক্ষক যথা মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী সাহেব, মুফতী রিযওয়ানুর রহমান সাহেব প্রমুখ হারদূয়ী সফরে রওয়ানা হন এবং সেখানে পৌঁছে হারদূয়ীর হযরতকে মাদরাসার কারগুযারী শোনান। দখলপ্রক্রিয়ার বিবরণ শুনে হারদূয়ীর হযরত খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

তিন. একবার হারদূয়ীর হযরত রহিমাহুল্লাহ উমরার সফরে গেলে মুফতী মনসূরুল হক সাহেবসহ রাহমানিয়ার কমিটির বড় একটি অংশ মদীনার মারকায তাইয়িবায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকারীদের সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্রই হারদূয়ী রহিমাহুল্লাহর প্রথম প্রশ্ন ছিল– "রাহমানিয়া কা কেয়া হাল হ্যায়।" (রাহমানিয়ার কী অবস্থা?) উত্তরে তাঁকে কিছু কার্যক্রম শোনানো হল এবং সেই সঙ্গে বলা হলো যে, দখলকারীগণ মুফতী আব্দুর রহমান সাহেবের নিকট আমাদের সঙ্গে সন্ধিপ্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন, আর মুফতী আব্দুর রহমান সাহেবও আমাদেরকে ডেকেছিলেন। একথা শোনামাত্রই হারদূয়ীর হযরত রহিমাহুল্লাহ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলতে লাগলেন, "কিয়া হক আওর বাতিল কে সাথ সুলাহ হো সাকতা হ্যায়? আগার তুম সুলাহ কারোগে তো য়ে সাবেত হো জায়েগা কে তুম লোগ বাতিল পর হ্যায় আও ও লোগ হক পর হ্যায়। আওর তুমহারি ইযযত খাক মে মিল জায়েগী।" (ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে কীভাবে সন্ধি হতে পারে? যদি তোমরা সন্ধি করো তাহলে প্রমাণ হবে যে, তোমরা অন্যায়ের উপর রয়েছো আর তারা ন্যায়ের উপর রয়েছে। এতে তোমাদের সম্মান ধূলোয় মিশে যাবে।) তখন মুফতী সাহেব বললেন, হযরত! আমি মুফতী আব্দুর রহমান সাহেবকে এক্ষুণি ফোন করছি যে, তিনি যেন এই সন্ধিপ্রস্তাবকে নাকচ করে দেন এবং এ ব্যাপারে অগ্রসর না হন। জবাবে হারদূয়ীর হযরত বললেন, "হাঁ, ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়, জাও আভী ফোন করো।" (হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, যাও এখনই ফোন করো!) অতঃপর মুফতী সাহেব তৎক্ষণাৎ কামরা থেকে বের হয়ে মুফতী আব্দুর রহমান সাহেবকে ফোন করলেন। মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব তখন চিটাগাং থেকে ফিরে ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করছিলেন। ফোন পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর? মুফতী মনসূরুল হক সাহেব বললেন, আমরা রাহমানিয়ার কারগুযারী শোনাতে গিয়ে এ ব্যাপারে আপনার সন্ধি-উদ্যোগের কথাও হারদূয়ীর হযরতকে জানিয়েছি। তিনি খুব রাগান্বিত হয়েছেন এবং একপর্যায়ে একথাও বলেছেন যে, "মুফতী আব্দুর রহমান আগার তুমহারা সালানা জালসা মে না আয়ে তো না-আয়ে, ছোড়ো উসকো" (এতে মুফতী আব্দুর রহমান যদি তোমাদের বার্ষিক মাহফিলে না আসে তো না আসুক, বাদ দাও তাকে!) একথা শোনেই মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব রহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন, ঠিক আছে, হযরত যেহেতু না করছেন, আমি আর এ ব্যাপারে অগ্রসর হচ্ছি না।

চার. ২০০১ সালে রাহমানিয়া বেদখল হওয়ার পর হারদূয়ীর হযরত রহিমাহুল্লাহ দুইবার বাংলাদেশ সফরে আসেন। প্রথম সফরে মুফতী মনসূরুল হক সাহেবদের পরিচালিত রাহমানিয়ার টিনশেডে তাশরীফ এনেছিলেন। এ সময় হযরত শাইখুল হাদীস রহ.-ও টিনশেডে তাশরীফ আনেন এবং হারদূয়ীর হযরতকে রাহমানিয়ার ভবনে তাশরীফ নেয়ার অনুরোধ জানান এবং নিজে তাকে সঙ্গে করে সেখানে নিয়ে যান। বস্তুত হারদূয়ীর হযরত রহিমাহুল্লাহর নিকট উভয় পক্ষের মুরুব্বীদেরই কমবেশী যাতায়াত ছিল। তিনি বাংলাদেশে আগমন করলে তার ফয়েয ও বরকত হাসিল করার জন্য উভয় পক্ষের মুরুব্বীগণকেই তাঁর কাছাকাছি দেখা যেতো। সে হিসেবে তিনি পুরো ব্যাপারটা দুই তরফ থেকেই জানতেন। তবে প্রথম সফরে কোন পক্ষই আগ বাড়িয়ে মধ্যস্থতার প্রস্তাব না করায় তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

পাঁচ. হারদূয়ীর হযরত রহিমাহুল্লাহ ২০০৪ সালে যখন সর্বশেষ বাংলাদেশ সফরে আসেন তখন উভয় পক্ষই তাকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে তাশরীফ রাখার দাওয়াত দিয়েছিলেন। তবে তিনি শাইখ রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত রাহমানিয়া ভবনে তাশরীফ রাখার দাওয়াত কবুল করেননি। বরং নিজস্ব প্যাডে লিখিত চিঠিতে কারণ উল্লেকপূর্বক অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন। চিঠির অনুবাদ–

"জনাব মাওলানা আজিজুল হক যীদা মাজদুহু! ০৮/১১/১৪২৫ হি. তারিখের দাওয়াতনামা পেয়েছি। কিন্তু উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে অবগত হয়েছি যে, আপনার তরফ থেকে যে বড় বে-উসূলী (অনিয়ম) প্রকাশ পেয়েছে তথা রাতের প্রহরে পুরনো জামিআ রাহমানিয়া কব্জা করা– এর এখনো কোনো তালাফী (সমাধান) করা হয়নি। এ জন্য আপনার ওখানে যেতে অপারগতা প্রকাশ করছি। সালামান্তে– আবরারুল হক। তারিখ: ১৫/১১/১৪২৫ হি. মোতাবেক ২৭/১২/২০০৪ খ্রি.।" (চিত্র: পৃষ্ঠা ৪৩)

সম্ভবত এই প্রেক্ষিতে হযরত শাইখুল হাদীস রহিমাহুল্লাহ হারদূয়ীর হযরতকে ব্যাপারটি সুরাহা করে দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সেমতে হারদূয়ীর হযরত রহিমাহুল্লাহ একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বিশদ অবগতির জন্য মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেব দা.বা. এবং মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব দা.বা.-কে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন যে, শাইখুল হাদীস রহিমাহুল্লাহর লোকজন কিভাবে মাদরাসা দখল করল, বৈধভাবে নাকি

অবৈধভাবে তদন্ত করে আমাকে জানাও। দায়িত্বপ্রাপ্তির অল্পদিনের মধ্যেই অসুস্থতার কারণে মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব হাসপাতালে ভর্তি হন আর মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব চোখের চিকিৎসার জন্য দুবাই সফরে যান। ফলে দ্রুততম সময়ে তাদের পক্ষে হারদূয়ীর হযরতকে কিছু জানানো সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সময়ে এই বিলম্বের জন্য হারদূয়ীর হযরত তাদেরকে তিরষ্কার করেছেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় এরই মধ্যে হারদূয়ীর হযরতের ইন্তেকাল হয়ে যায়। রহিমাহুল্লাহু রাহমাতান ওয়াসিআতান।

সন্ধির ব্যাপারে হারদূয়ীর হযরতের অনীহার কারণ:
কারো মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে, হারদূয়ীর হযরত রহ. সন্ধি করতে নিষেধ করলেন কেন? হারদূয়ীর হযরতের উল্লিখিত চিঠির শেষ কথাটায় এর উত্তর নিহিত আছে। সেটা হলো, এক পক্ষ একটা জায়গা জবরদখল করে রেখেছিলো। সেই জায়গাটা যতোদিন তারা জবরদখল করে রাখবে, ততোদিন তো তাদের সঙ্গে সন্ধির কথা চলতে পারে না।

মাদরাসা বেদখল হওয়ার পর দখলের শিকার শিক্ষক-ছাত্রদের অবস্থা এবং জামিআ রাহমানিয়ার পরিচালনা কমিটির নৈতিক অবস্থান

সকল শিক্ষক ও স্টাফের (কয়েকজন ছাড়া) পাঁচতলা ভবন ত্যাগ এবং নতুন ঠিকানায় জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার কার্যক্রম আরম্ভের সিদ্ধান্ত: ২০০১ খ্রিস্টাব্দের ৩রা নভেম্বর বিকেল থেকে রাত্রিনাগাদ সংঘটিত সহিংস জবরদখলকাণ্ডে জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার পাঁচতলা ভবন বৈধ কমিটির হাতছাড়া হয়ে যায়। ফলে কয়েকজন ছাড়া সকল (৩৬ জন) শিক্ষক, দুয়েকজন ছাড়া সকল স্টাফ যথা: দপ্তরের প্রবীণ খাদিম জনাব হায়দার আলী, মরহুম জাকির হোসেন, জনাব আলাউদ্দীন, বোর্ডিং ম্যানেজার জনাব মীর হোসেন, বাবুর্চি জনাব আব্দুল মালেক, মরহুম গোলাম মোস্তফা, জনাব নূরুল ইসলাম, জনাব আমীর হোসেন এবং জনাব শফীকুল ইসলামসহ প্রায় ৫০ জন শিক্ষক-কর্মচারী আপাতত কর্মস্থল হারিয়ে ফেলেন।

এরপর সকলে মিলে পরামর্শক্রমে অনতিদূরেই রাহমানিয়া ভবনের জমিদাতা জনাব আলহাজ্জ নূর হোসেন কোম্পানীকে তাঁর মালিকানাধীন বেড়িবাঁধ সংলগ্ন মৎসখামার ভরাট করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কয়েকটি টিনশেড নির্মাণ করে দেয়ার আহ্বান জানান। আলহাজ্জ নূর হোসেন কোম্পানী তাদের সে আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেন। সেমতে তিনি অনতিবিলম্বে টিনশেড নির্মাণের কাজ শুরু করেন। নির্মিতব্য এই টিনশেডগুলোতে এবং নূর হোসেন কোম্পানীর নিজস্ব একাধিক ভবনের নিচতলায় জামিআ রাহমানিয়ার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কমিটি কর্তৃক পুরনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা: যেহেতু জামিআ রাহমানিয়ার পরিচালনা সংক্রান্ত প্রায় সকল অফিসিয়াল কাগজপত্র জামিআ রাহমানিয়ার পরিচালনা কমিটির হাতে বিদ্যমান ছিল এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এই কমিটির মেয়াদ আরো ২ বছর অবশিষ্ট ছিল- (কারণ এর একবছর আগেই ২৮/৪/২০০০ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবারে অনুষ্ঠিত ৯৮ নং সাধারণ অধিবেশনে এই কমিটি নবায়ন করা হয়েছিল।) সেহেতু জামিআর পুরনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টটিও এই কমিটির হাতে ছিল। সে সময় (২০০১) থেকে এখনও (২০২১ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত পূবালী ও অগ্রণী ব্যাংকে জামিআ রাহমানিয়ার নামে যে সঞ্চয়ী হিসাব রয়েছে তা এই পরিচালনা কমিটি পরিচালনা করে আসছে। পক্ষান্তরে জবরদখলের পর দখলদাররা তাদের কোন আইনী বৈধতা না থাকায় পুরনো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে সক্ষম হয়নি। ফলে তারা ইসলামী ব্যাংকে নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে বাধ্য হয়েছিল।

ট্রেডমার্ক ব্যবহার: নতুন ঠিকানায় জামিআ রাহমানিয়ার কার্যক্রম আরম্ভ করার পর রাহমানিয়ার ট্রেডমার্কও পরিচালনা কমিটির ব্যবহারে ছিল এবং অদ্যাবধি ব্যবহারে আছে, যা ট্রেডমার্ক জার্নাল নং ২৪৬, মার্চ ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে এই কমিটির দরখাস্তের সূত্রে প্রকাশিত হয়েছে। দরখাস্ত নং ৭৮৭৯৪।

কমিটির বৈধতার অন্যতম আলামত ধারাবাহিকতা ও পরম্পরা: এছাড়া এই কমিটির বৈধতার একটি বড় আলামত হলো, এই কমিটির সদস্যগণের প্রধান অংশ জামিআ রাহমানিয়ার প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই পরিচালনা কমিটিতে যুক্ত আছেন এবং এই কমিটি সেই প্রতিষ্ঠাকালীন কমিটিরই পরম্পরা, যা গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতি তিন বছর পরপর নবায়ন হয়ে আসছে।

কমিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও পরম্পরার প্রমাণ: কমিটির সভাপতি হাজী আব্দুল মালেক সাহেব জামিআর প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ছিলেন।[১] যিনি নূরানী তালীমুল কুরআন ওয়াকফ এস্টেটের মুতাওয়াল্লীও ছিলেন। এছাড়া কমিটির সেক্রেটারী জনাব আহমদ ফজলুর রহমান সাহেবও প্রতিষ্ঠাকালীন অর্থ সম্পাদক। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে দখল পর্যন্ত এবং দখলপরবর্তী সময়েও হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান দা.বা. ছিলেন এই কমিটির অন্যতম সদস্য। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে উল্লিখিত হাজী আব্দুল মালেক সাহেবের ভাই হাজী আব্দুল মতীন সাহেব প্রথমত সহসভাপতি এবং পরবর্তীকালে সভাপতি হয়েছেন। এছাড়া মাদরাসার জমিদাতাদ্বয় জনাব নূর হোসেন কোম্পানী ও হাজী মুহাম্মদ আলীও জবরদখলের আগে থেকেই এই কমিটির সদস্য। তারা উভয়ে জবরদখলের সময় ও আগে দখলকারীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন।

শিক্ষা কার্যক্রম শুরু: যে রমাযান মাসের আগমুহূর্তে জামিআ রাহমানিয়া বেদখল হয় সে রমাযানের শুরুর দিকেই নবনির্মিত টিনশেড ও নূর হোসেন কোম্পানী সাহেবের কয়েকটি বিল্ডিংয়ের নিচতলায় শুরু হয় জামিআর ভর্তি কার্যক্রম। জামিআর ৩৬ জন উস্তায, পাঁচশতাধিক ছাত্র, তিনজন দপ্তরী, দোকানদার, বোর্ডিং ম্যানেজার এবং বাবুর্চিগণ চলে আসায় রমাযানের পর যথাসময়ে মক্তব থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত নিয়মিত ক্লাস শুরু হয়ে যায়।

জবরদখলকারীগণ কর্তৃক অবৈধভাবে "জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া" নাম ব্যবহার: যেহেতু একবছর আগেই বৈধ কমিটি সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল, সুতরাং জয়েন্ট স্টক কোম্পানীতে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানটি (নিবন্ধন নং ১২২৯ (৪০)/৮৮) অব্যাহতভাবে পূর্বের নামেই চলমান থাকে, যদিও মূল ভবন বেহাত হয়ে গিয়েছিল। অপরদিকে ভবন যারা জবরদখল করেছিল তারা যদিও ছিলেন তদানীন্তন জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া হাকীকিয়া-যা শাইখুল হাদীস রহ. জামিআ রাহমানিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর মোহাম্মদী হাউজিংয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন-এর ছাত্র-শিক্ষক; কিন্তু যেহেতু তারা জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার ভবনটি দখল করে রেখেছিলেন সেজন্য তারা 'জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া' নামটিই ব্যবহার করছিলেন, যা ব্যবহারের কোনোরকম আইনী বৈধতা তাদের ছিল না।

---

১. প্রতিষ্ঠাকালীন জয়েন্ট স্টক কোম্পানীতে দাখিলকৃত গঠনতন্ত্র দ্রষ্টব্য।

জবরদখলকারীগণ কর্তৃক বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যায় 'জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া' নাম ব্যবহারে বাধাসৃষ্টি এবং মাওলানা নূরুদ্দীন গহরপুরী রহ. কর্তৃক বৈধপক্ষকে সুসমর্থন:

দখলকৃত ও নতুন ঠিকানায় পরিচালিত দুটি মাদরাসারই বোর্ড পরীক্ষার প্রসঙ্গ থাকায় কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড 'বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যাহ'য় নিবন্ধন প্রশ্নে বেফাকের অফিসে একদিন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা উঠে। শাইখ রহিমাহুল্লাহ খেলাফত মজলিসের বেশ ক'জন সদস্যকে নিয়ে উপস্থিত হন। বৈধপক্ষের দিক থেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুফতী মনসূরুল হক সাহেব ও মুহতামিম মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব। হযরত নূরুদ্দীন গহরপুরী রহিমাহুল্লাহ তখন বেফাক-এর সভাপতি। দ্বিপাক্ষিক এই মিটিংয়ে আছর থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত বৈধপক্ষ যেন নিজেদের নতুন ঠিকানার প্রতিষ্ঠানটিকে 'জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া' নামে বেফাকে নিবন্ধন করতে না পারে সেজন্য দখলদারদের পক্ষ হতে চাপ সৃষ্টি করা হয়। মাওলানা নূরুদ্দীন গহরপুরী হুযূর যতই বলেন যে, দুই মাদরাসাই এই নামে থাকুক, কিন্তু শাইখপক্ষ মোটেই মানছিলেন না এবং শাইখ রহিমাহুল্লাহ যা বলছিলেন শাইখ রহিমাহুল্লাহর সঙ্গীরা তাতে জোরদার সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন। শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলছিলেন যে, আমি তো নতুন মাদরাসা করার সময় কিছুটা বাড়িয়ে হাকীকিয়া নাম দিয়েছিলাম, কাজেই তারাও কিছু বাড়াক বা পরিবর্তন করুক! আলোচনা করতে করতে মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে যায়। এ সময় গহরপুরী রহ. বললেন, আমি মাগরিবের পর একটি প্রস্তাব দিব আপনারা সকলে মেনে নিয়েন। মাগরিবের পর তিনি প্রস্তাব করেন যে, বেফাকবোর্ডে দুটো প্রতিষ্ঠানই রাহমানিয়া নামে থাকবে, তবে মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের পক্ষেরটিতে রাহমানিয়া কথাটি ব্র্যাকেটের ভেতর থাকবে। এটা সবাই মেনে নিলেন, কেউ কোনো শব্দ করলেন না। সিদ্ধান্ত শেষে বের হওয়ার পর হযরত গহরপুরী রহ. মুফতী মনসূরুল হক সাহেব ও মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবকে বললেন, ব্রাকেটের মাধ্যমে আপনাদেরকে 'মাহফুজ' (সংরক্ষিত) করে দিলাম।

জবরদখলকারীদের পক্ষ হতে দখল-আক্রান্তদের বিরুদ্ধে অবাস্তব অভিযোগ তুলে দায়েরকৃত মামলাসমূহের বিবরণ

নূতন ঠিকানায় প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করতে মাওলানা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী ও মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনে মামলা:

মাদরাসা জবরদখল করার পাঁচদিন পর দখলদারগণ তাদের দখলকৃত মাদরাসার একজন দায়িত্বশীল মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব (কুষ্টিয়া)-কে বাদী বানিয়ে মাদরাসার প্যাড ব্যবহার করে মাওলানা হিফজুর রহমানকে প্রধান আসামী এবং মুফতী মনসূরুল হককে দ্বিতীয় আসামী বানিয়ে সম্পূর্ণ বানোয়াট এক কল্পকাহিনী সাজিয়ে বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করে। (মামলা নং ৪৩, মামলার তারিখ ৮/১১/২০০১)। দখলদারগণ এই মামলার মাধ্যমে মুফতী মনসূরুল হক সাহেব ও মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব নিজেদের সঙ্গে চলে আসা এক-দুইজন বাদে সকল উস্তায ও সকল স্টাফকে নিয়ে জনাব নূর হোসেন কোম্পানীর বিল্ডিংয়ের নিচতলায় যে মাদরাসা অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন, সেটাকে বাধাগ্রস্ত করতে চাচ্ছিল। এর প্রমাণ হলো, দখলদারগণ মামলার এজাহারে উল্লেখ করে যে, *"তাহারা উপরোল্লিখিত তিন আসামীর প্রশ্রয়ে এবং তত্ত্বাবধানে মাদরাসার সন্নিকটে বিল্ডিং নং-৭ (নীচতলা) আলী এন্ড নূর রিয়েল এষ্টেট, থানা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা থাকিয়া বিভিন্ন রকমের অপতৎপরতা চালাইতেছে।"* (চিত্র: পৃষ্ঠা ৪৪)

উল্লেখ্য যে, এই সাত নম্বর বিল্ডিংয়ের নিচতলাটি মূলত জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার ভবন হাতছাড়া হওয়ার কারণে মাদরাসা চলমান রাখার জন্য পড়াশোনা ও ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহার হচ্ছিল। মামলার এজাহারে এটাকেই তারা "অপতৎপরতা" বলে উল্লেখ করেছে। চমকপ্রদ বিষয় হল, আশির দশকে জামিআ মুহাম্মাদিয়া থেকে আসার পর জনাব নূর হোসেন কোম্পানীর এই সাত নম্বর বিল্ডিংয়েই জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়ার সূচনা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে রাহমানিয়া ভবন নির্মাণ হয়েছিল।

মামলার এজাহারে তারা আরও লিখেছে, *"তাহারা উক্ত মাদরাসার গেটে উপস্থিত হইয়া ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীদের জীবননাশের হুমকিসহ বিভিন্ন ধরনের ভীতি প্রদর্শন করিয়া মাদরাসা ও মাদরাসার সম্পত্তি দখল করার চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করিলে উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারীদের উপস্থিতি ও সম্ভাব্য প্রতিরোধের আশঙ্কা করিয়া ও বাঁধার মুখে আসামীগণ মাদরাসার গেটে ৭/৮টি ককটেল ও বোমা ফাটাইয়া মাদরাসা ও মাদরাসা সংলগ্ন এলাকার জনগণ ও মাদরাসার উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীদের মনে মারাত্মক ভীতি, আতঙ্ক ও ত্রাস সৃষ্টি করিয়া এবং অচিরেই আবার পুনরায় আরো ভয়াবহ হামলা করিয়া তাহারা মাদরাসা ও মাদরাসার সম্পত্তি দখল করার হুমকী প্রদান করিয়া চলিয়া যায়।"* (চিত্র: পৃষ্ঠা ৪৫)

মামলার পুরো বর্ণনাটাই ছিল সম্পূর্ণ বানোয়াট ও অবাস্তব। মূলত ২০০১ সালে জামিআ রাহমানিয়া হাতছাড়া হওয়ার পর হারদূঈর হযরতের নির্দেশক্রমে বৈধ কমিটি ও অভ্যন্তরীণ মুরুব্বীদের ঘোষিত নীতি ছিল অপরপক্ষের সঙ্গে সংঘাতে না যাওয়া এবং পেশীশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মাদরাসা পুনরুদ্ধার না করা; বরং এগুলোর পরিবর্তে আইনী কার্যক্রম চালানো। অতঃপর আইনের মাধ্যমে যদি মাদরাসা ফিরে পাওয়া যায় তাহলে তা গ্রহণ করা; অন্যথায় নয়। এই নীতি অনুযায়ী সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা কখনো সংঘাতের পথ অবলম্বন করেননি।

এই মামলায় মাওলানা হিফজুর রহমান ও মুফতী মনসূরুল হকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারী হয়ে যায় এবং পুলিশ তাদের বাড়িতে হানা দেয়। তখন তারা হাইকোর্ট থেকে জামিন গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে মামলাটি আদালতে খারিজ হয়ে যায় এবং আসামীদেরকে দায়মুক্ত ঘোষণা করা হয়। (খারিজ মামলা নং ২০৩, তারিখ ১/২/২০০৩)।

নূরানী তালীমুল কুরআন ওয়াকফ এস্টেটের মুরুব্বী মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব এবং মুফতী মনসূরুল হককে আবারো মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা:

জবরদখলকারীগণ তাদের একজন শিক্ষক মাওলানা আবু বকর সিদ্দিককে প্রতিনিধি বানিয়ে আবারও একটি সাজানো মামলা দায়ের করে। পিটিশন মোকাদ্দমা নং ১২২০/২০০৬। এর আগে তারা মুহাম্মদপুর থানায় একটি জিডি করে। জিডি নং ১১৭/(১) ২০০৬। জিডিটিকে উক্ত পিটিশন মোকাদ্দমার রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই মামলায় তারা ২নং আসামী বানায় সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম নূরানী তালীমুল কুরআন ওয়াকফ এস্টেটের সাবেক পরিচালক হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব রহ.-কে। উল্লেখ্য, রাহমানিয়া ভবন জবরদখলের পর দখলকারীগণ নূরানী তালীমুল কুরআন ওয়াকফ এস্টেটের জন্য ভবনের বরাদ্দকৃত অংশ (তৃতীয় তলার দক্ষিণপার্শ্ব) থেকে মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেবকেও চলে যেতে বাধ্য করেছিল। সেই কারণে দখলদাররা মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে তাঁকে চাপে রাখার পন্থা গ্রহণ করে। অথচ মুফতী

মনসূরুল হক সাহেবের পাশাপাশি মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেবের ব্যাপারেও শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলতেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ যদি জিজ্ঞেস করেন কী নিয়ে এসেছো, আমি এই দুজনকে পেশ করবো। আর ৩নং আসামী বানায় মুফতী মনসূরুল হক সাহেবকে। এছাড়াও অনেক নিরপরাধ ছাত্রদেরকে আসামী বানায়। মামলার বিবরণে তারা লিখেছে, *"১-৫নং দ্বিতীয়পক্ষের প্রত্যক্ষ মদদে ৬-১৪নং দ্বিতীয়পক্ষগণ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রথমপক্ষ প্রতিষ্ঠানের পার্শ্ববর্তী স্থানে জড়ো হইয়া মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের জীবন নাশের হুমকী প্রদান করে।"* (চিত্র: পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭)

অথচ এরকম কোনো ঘটনা কখনোই ঘটেনি।

জবরদখলকারীগণ কর্তৃক পরিচালনা কমিটির সদস্যদের কারান্তরীণ করার চেষ্টা:

আগেই বলা হয়েছে যে, বৈধ পরিচালনা কমিটির মূল ও সিনিয়র সদস্যগণ ছিলেন জামিআ রাহমানিয়ার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। যখন এই পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ওয়াকফ প্রশাসনে ২৭/১২/২০০৬ কমিটির নাম তালিকাভুক্তি দরখাস্ত করে অনুমোদনের বিধিসম্মত চেষ্টা করেন, তখন জবরদখলকারীগণ ভায়োলেশন মিস কেস ১২/২০০৭ রুজু করে। সেখানের আর্জিতে তারা পরিচালনা কমিটির সদস্যদেরকে দেওয়ানী কারাগারে আটকের আর্জি জানায়। (চিত্র: পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯)

জুলুমের শিকার দখল-আক্রান্তগণ এবং বৈধ পরিচালনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত আইনী কার্যক্রম

থানা-পুলিশকে ম্যানেজ করে বৈধ পরিচালনা কমিটির পক্ষে কাজ না করার পরিস্থিতি সৃষ্টি:

২০০১ এর ঘটনার পর এমনকি ঘটনার মুহূর্তেও আক্রান্ত শিক্ষকগণ ও পরিচালনা কমিটি বহুবার থানায় যোগাযোগ করেছে। কিন্তু কোন ফল পায়নি। এ ঘটনার পরের রাতে কমিটির সদস্যগণ দীর্ঘ ৪/৫ ঘণ্টা থানায় অপেক্ষা করার পর মামলা গ্রহণ করা হবে না বলে তাদের ফিরিয়ে দেয়া হয়।

এরপর কমিটির লোকজন স্থানীয় এম.পি'র সাথে যোগাযোগ করে এবং বিষয়টি তদন্ত করে সুষ্ঠু বিচারের দাবী জানায়। তারপর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথেও কমিটির লোকজন সাক্ষাৎ করে সুফল পেতে ব্যর্থ হন। এমনকি তৎকালীন বিএনপি প্রধানমন্ত্রী বরাবর আবেদন জানিয়েও পত্রিকায় বিবৃতি দেওয়া হয়। তবুও তারা কোনো মামলা গ্রহণ করেনি।

পরবর্তীতে পরিচালনা কমিটি এ ব্যাপারে ০৭-১১-২০০১ খ্রি. তারিখে প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। তাতে এ সব ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়। উক্ত সংবাদ ০৮-১১-২০০১ খ্রি. তারিখে দৈনিক ইনকিলাব, প্রথম আলো, যুগান্তর, ইত্তেফাক এবং ০৯-১১-২০০১ খ্রি. তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

পরিশেষে দখলকালে ভাঙচুর, মারপিট ও মালামাল তসরুফ বিষয়ে থানা মামলা গ্রহণ করলেও (মুহাম্মদপুর থানায় মামলা নং ১৩/(১১)২০০১) থানার উপর অজানা চাপের কারণে কয়েকজন এস আই বদলী করে মামলার ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, সর্বশেষ এস আই অসত্য রিপোর্ট দিতে বাধ্য হলেও তিনি এতটুকু স্বীকার করেন যে, "নির্বাচনের পরে যেভাবে বিভিন্ন স্থানে জবরদখল হয় এবং অপরাধ সংঘটিত হয়, এখানেও তা হয়েছে। তবে স্বাক্ষীর অভাবে আসামীদের শনাক্ত করা সম্ভব হলো না। অবশ্য ভবিষ্যতে আসামীদের শনাক্ত করা সম্ভব হলে মোকাদ্দামাটি পুনর্জীবিত করা যাবে।" (চিত্র: পৃষ্ঠা ৫০)

এভাবে চাপ সৃষ্টি ও ম্যানেজ করে মামলার কার্যক্রম ব্যাহত করা হয়। জামিআ রাহমানিয়ার (লালবাগ থেকে অদ্যাবধি) প্রবীণ স্টাফ জনাব হায়দার আলী বলেন, *"২০০১ সালের ৩রা নভেম্বর তারা দখল করতে আসলে তিনি আল মারকাযুল ইসলামীর মুফতী শহীদুল ইসলামের পাশে দাঁড়িয়ে মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের কামরায় আক্রমণের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। তখন মুফতী শহীদুল ইসলাম মুফতী সাহেবকে লক্ষ্য করে বলছিলেন, "হুজুর আমি মাদরাসাটা দখলের জন্য আগেই আসতাম। কিন্তু ইলেকশনের গোলমাল ছিল। এজন্য আগে আসতে পারি নাই। এই দখলকাজে আমার ২৯ লাখ টাকা খরচ গেছে।"* এছাড়াও মুফতী সাহেবের বর্ণনামতে মুফতী শহীদুল ইসলাম বলেন যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে মুহাম্মদপুর থানা পর্যন্ত পুরোটা ম্যানেজ করে তিনি এসেছেন। তিনি মুফতী সাহেবকে মাদরাসাটি আর নেওয়ার চেষ্টা না করার জন্য বলেন। এটাও বলেন যে, মুফতী সাহেব মাদরাসাটি আর নিতে পারবেন না।

এমনিভাবে শাইখ রহ.-এর বড় সাহেবযাদা মাওলানা মাহমুদুল হক দখলের পর মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের বাসায় এসে তাঁকে শাইখের পক্ষে যোগদানের অনুরোধ করেন। তখন মুফতী সাহেব অমত প্রকাশ করলে বলেন যে, "কেয়ামত পর্যন্ত মাদরাসা আর পাবেন না।" এমন কথা বলার পেছনে মজবুত ক্ষমতার বিদ্যমানতা কাজ করেছে বলেই অনুমিত হয়।

দখলকালে বিভিন্ন ফৌজদারী অপরাধ সংঘটিত করার ব্যাপারে কমিটিপক্ষের ফৌজদারী মামলা ও পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদনগুলোতে ঘটনার সত্যতা স্বীকার:

দখলকালে দখলদাররা বেশ কিছু ফৌজদারী অপরাধ সংঘটিত করেছিল। যথা মারপিট, অর্থ তসরুফ, ভাঙচুর ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো নিয়ে ২০০১ এর নভেম্বরে এবং ২০০৭ এ কয়েকটি মামলা করা হয়। এই মামলাগুলো দখল নিয়ে নয় বরং দখলকালে সংঘটিত বিভিন্ন ফৌজদারী অপরাধ নিয়ে। মামলাগুলোর তদন্ত প্রতিবেদনে ফৌজদারী অপরাধের ঘটনা স্বীকার করা হয়। কিন্তু মামলাগুলোর তদন্তকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করায় আসামী শনাক্ত করা যায়নি বা এই ধরনের অস্পষ্ট কথা বলে অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অপরাধীদের আইনের ফাঁকফোকড়ে বেঁচে যাওয়া এক কথা আর বাস্তবেই অপরাধ সংঘটিত না হওয়া ভিন্ন কথা। এখানে ব্যাপারটি তাই হয়েছে। অপরাধী কারা সবাই জানা সত্ত্বেও বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তাদেরক বাঁচানো হয়েছে।

দখলদারদের "দখল সংক্রান্ত সকল মামলা খারিজ হয়ে গেছে" দাবীর অবাস্তবতা:

দখলকারী পক্ষের একটি লেখায় বলা হয়েছে, "দখল সংক্রান্ত সকল মামলা খারিজ হয়ে গেছে"। তাদের এই কথা অবাস্তব। মূলত জায়গাটি ওয়াকফ সম্পত্তি হওয়ায় এখানে দখলের প্রতিকারের পদ্ধতি হলো ওয়াকফ প্রশাসনের কাছে বৈধ কমিটি তালিকাভুক্ত করে অবৈধ কমিটিকে উচ্ছেদের আবেদন জানানো। বৈধ পরিচালনা কমিটি এই কাজটিই করেছে এবং এই বিষয়ের মামলাগুলোতে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেছে। (এর বিবরণ সামনে আসছে)। সরাসরি দখলের প্রতিকার চেয়ে এবং তাদের উচ্ছেদের আবেদন জানিয়ে অনেক পরে মাত্র একটি মামলা করা হয়েছে এবং সেটাও ১২ বছর পূর্ণ হয়ে তামাদি আইনে বারিত হবার আশঙ্কায়। সেই বিবরণও সামনে আসছে। মূলত যে দুয়েকটি মামলা খারিজ হয়েছে বলা হচ্ছে তা হলো ফৌজদারী অপরাধ সংক্রান্ত মামলা। তাও অপরাধী না হবার কারণে নয়। বরং শনাক্ত করা যায়নি, আলামত পাওয়া যায়নি-ধরনের আজগুবি কথাবার্তা দিয়ে। মুহাম্মদপুর থানায় মামলা নং

১৩/(১১)২০০১ এর তদন্ত রিপোর্টে এসআই স্পষ্ট লিখেছে যে, *দখল করতে গিয়ে মারপিট, সম্পদ তসরুফ ও ভাঙচুরের ঘটনাগুলো সত্য। তবে আসামী শনাক্ত করা যায়নি। ভবিষ্যতে শনাক্ত করা গেলে মামলাটি পুনর্জীবিত করা যাবে।*

এমনিভাবে ২৭/০৫/২০০৭ এ করা মারপিট, সম্পদ তসরুফ ও ভাঙচুরের মামলার (মুহাম্মদপুর থানা মামলা নং ১০৭) তদন্ত রিপোর্টে এসআই আব্দুল লতীফ লেখেন,

"আমার হাতে প্রাপ্ত তথ্যাদি সংলাপ ও এই পত্রের পারিপার্শ্বিক বিষয়াদির আলোকে অত্র মামলার অভিযোগপত্রের ৩, ৪, ৫নং কলামে বর্ণিত আসামীদের বিরুদ্ধে দ.বি. আইনের ১৪৪/১৪৭/১৪৮/৩৪২/... ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়।" (মাদরাসার ফাইল দ্রষ্টব্য)

এছাড়া বিস্ফোরক আইনে মুহাম্মদপুর থানা মামলা নং ১০৮/২০০১ এর তদন্ত রিপোর্টেও এসআই আব্দুল লতীফ অত্র মামলার ঘটনার সময় ৩০/৩৫ জন আসামী একযোগে মাদরাসা ভবনে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করায় বিকট শব্দ ও আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। যদিও মামলার মূল বিষয়ে তথা বিস্ফোরণের বিষয়ে প্রভাবিত হয়ে এবং নয়-ছয় বলে আসামীদের দায়মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। (চিত্র: পৃষ্ঠা ৫০)

গুরুত্বপূর্ণ প্রধান মামলাগুলোতে দখলদারদের পরাজয় এবং মামলার রায়গুলো বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের বাধা সৃষ্টি

দখলদারদের গঠিত আহ্বায়ক কমিটিকে অবৈধ ঘোষণার জন্য মামলা এবং চূড়ান্ত রায়ে বানোয়াট কমিটিকে অবৈধ ঘোষণা:

বৈধ কমিটিপক্ষ মাদরাসা দখলের পরপরই কোর্টে দখলদারদের ঘোষিত আহ্বায়ক কমিটিকে অবৈধ ঘোষণার আর্জি জানিয়ে একটি মামলা দায়ের করেন, (মামলা নং ৪১০, তারিখ ২০/১১/২০০১) এবং দখলদারদের কার্যক্রমের উপর ইনজাংশন প্রার্থনা করেন। মাননীয় আদালত প্রথম আদেশেই দখলদারদের গঠিত আহ্বায়ক কমিটির কার্যক্রমের উপর ইনজাংশন জারী করেন।

অতঃপর উভয় পক্ষকে শুনানী করে বাদী মাদরাসা (বৈধ কমিটি) ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকাণ্ড যথারীতি পরিচালিত হবার নিমিত্তে উভয় পক্ষকে মামলা নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত স্থিতিবস্থা বলবৎ রাখার আদেশ দেন। (উল্লেখ্য এই স্থিতি আদেশ বাদীর দরখাস্তমতে এই মর্মে চাওয়া হয়েছিল যে, এই সম্পত্তি বাদীর মালিকানাধীন ও ভোগদখলে থাকা অবস্থায় বিবাদী (দখলদারপক্ষ) যেন কোনো বাধা সৃষ্টি না করতে পারে। সুতরাং এই স্থিতি আদেশ বৈধ পরিচালনা কমিটির কার্যক্রমে বাধাসৃষ্টিকারী হবার কারণ নেই)

আদালতের স্থিতি আদেশ অমান্য করে দখলদারদের পরিচালনা কমিটি গঠন এবং প্রাথমিক আদালতের গোলমেলে রায়:

কিন্তু এই স্থিতি আদেশ মান্য না করে দখলদারপক্ষ ২৯/৩/২০০২ তারিখে ১২ সদস্যের একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করে। যা ছিল আইনত সম্পূর্ণ অবৈধ এবং এই ১২ সদস্যের কমিটির পক্ষে দখলদারগণ যৌক্তিকতা তুলে ধরতে গিয়ে যে আর্গুমেন্ট তৈরি করে তা ছিল বাস্তবতা বিবর্জিত। তাদের আর্গুমেন্টে তারা বলতে চেষ্টা করেন যে, জামিআ রাহমানিয়ার পরিচালনা কমিটি ১৯৯২ সন থেকে ১৯৯৯ সন পর্যন্ত নবায়ন হয়নি। সে জন্য তারা ৩/১১/২০০১ তারিখে সাধারণ সভা ডেকে নতুন কমিটি গঠন করেছে, ফলে প্রকৃত পরিচালনা কমিটি একটি অবৈধ কমিটি। এই অবাস্তব আর্গুমেন্টের ভিত্তিতে এবং অদৃশ্য শক্তির বলে ১৫/৪/২০১০ তারিখে উক্ত মামলায় প্রাথমিক আদালত গোলমেলে রায় প্রদান করেন এবং বলেন যে, আহ্বায়ক কমিটিকে অবৈধ কমিটি বলা যায় না।[২] (উল্লেখ্য, এই রায় গোলমেলে হওয়ার কারণ হলো, এতে একদিকে আহ্বায়ক কমিটিকে অবৈধ বলা যায় না বলা হয়েছে কিন্তু চলমান প্রকৃত কমিটিকেও অবৈধ বলেনি বা বলতে পারেনি)

গোলমেলে রায়ের বিরুদ্ধে প্রকৃত কমিটির হাইকোর্টে আপীল এবং দখলদারদের বানোয়াট কমিটিকে অবৈধ ঘোষণা:

তারপর প্রকৃত ও চলমান কমিটি উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেন। (মামলা নং ৮৩৬/২০১১)। উক্ত আপীলে দীর্ঘ শুনানীতে দখলদারপক্ষের আর্গুমেন্টের অসত্য ও বানোয়াট বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। সেখানে কাগজপত্রসহ দেখানো হয় যে, ১৯৯২ সালের পর থেকে সবসময়ই গঠনতন্ত্রের ধারা-৫ অনুযায়ী তিন বছর পর পর কমিটি নবায়ন করা হয়েছে এবং তৎকালীন কমিটির সভাগুলোতে শাইখ রহ.-এর স্বাক্ষর রয়েছে। সর্বশেষ ২৮/৪/২০০০ শুক্রবার তারিখে অনুষ্ঠিত ৯৮ নং সাধারণ অধিবেশনে এই কমিটি নবায়ন হয়েছে। সুতরাং এর মেয়াদ ২৮/৪/২০০৩ পর্যন্ত বাকি রয়েছে। অতএব বৈধ মেয়াদী কমিটি বিদ্যমান থাকার পরও দখলদারদের দ্বারা ৩/১১/২০০১ তারিখে গঠনতন্ত্রবিরোধী এই আহ্বায়ক কমিটি গঠন ও পরদিন ইনকিলাব পত্রিকায় ঘোষণা দেয়ার কোনো বৈধতা থাকে না এবং আহ্বায়ক কমিটির মাধ্যমে ১২ সদস্যের পরিচালনা কমিটি গঠন সম্পূর্ণ অবৈধ প্রমাণিত হয়। অতঃপর এই আর্গুমেন্টের উপর ভিত্তি করে মাননীয় হাইকোর্ট ২৮/৪/২০০০ শুক্রবার তারিখে অনুষ্ঠিত ৯৮ নং সাধারণ অধিবেশনে গঠিত মাদরাসা পরিচালনা কমিটিকে বৈধ কমিটি বলে ঘোষণা করেন এবং দখলদারদের বানোয়াট আহ্বায়ক কমিটি ও তাদের পরবর্তী সিদ্ধান্তসমূহ বাতিল ঘোষণা দেন। রায়ে বলা হয়,

'The press release dated 04.11.2001 published in the Daily Inquilab by the defendants and that the Constitution of 9 member Convenying Committee by defendant no.1 on 03.11.2001 for Jameya Rahmania Arabia Madrsha is illegal, inoperative and not binding upon the plaintiffs.'

অর্থাৎ "শাইখুল হাদীস রহ.-এর ঘোষিত আহ্বায়ক কমিটি অবৈধ, অকার্যকর, এবং বাদীর উপর প্রযোজ্য নয়।" (চিত্র: পৃষ্ঠা ৫১)

অতঃপর উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে দখলদারগণ সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগে সিপি নং-১৩২৬/২০১২ দায়ের করেন, যা গত

---

২. এর ঠিক কয়েক মাস পরই দখলদারপক্ষের কমিটিকে ওয়াকফ প্রশাসন ১ বছরের জন্য অনুমোদন দেয় এবং সেখানে তারা লেখে- 'ওয়াকফ এস্টেটের বৃহত্তর স্বার্থে অনুমোদন দেওয়া হল।' (চিত্র: পৃষ্ঠা ৬৩) অথচ প্রকৃত কমিটিকে দেওয়া অনুমোদনপত্রে উল্লেখ ছিলো- 'ওয়াকফ এস্টেট প্রচলিত আইনের বিধান অনুসারে তালিকাভুক্ত করা হল।' (চিত্র: পৃষ্ঠা ৬২) এমনিভাবে ২০২০ সালে প্রকৃত কমিটির অনুমোদনপত্রে লেখা ছিল- 'মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্টের আদেশ বিবেচনান্তে... তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী অনুমোদন করা হল।' (চিত্র: পৃষ্ঠা ৫৯)। দু'পক্ষের অনুমোদনের বক্তব্যের পার্থক্যগুলো লক্ষ করুন তাহলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, দখলদারকে দেওয়া একবছর মেয়াদী অনুমোদনটি বৈধতার ভিত্তিতে নয় বরং লিয়াজোঁর ভিত্তিতে হয়েছিল। উল্লেখ্য, লিয়াজোঁভিত্তিক এই অনুমোদন প্রদান করা সত্ত্বেও তা আলোর মুখ দেখতে পারেনি; বরং প্রকৃত কমিটির রীটের মাধ্যমে সাথে সাথেই স্থগিত হয়ে যায়। অতঃপর এই রীটটি পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন না থাকায় তুলে নেওয়া হয়।

১৩/০১/১০১৬ খ্রি. তারিখে উভয়পক্ষের শুনানীতে খারিজ হয়েছে এবং রায়ে বলে দেওয়া হয়েছে যে–

We are of the further view that with the death of the sole petitioner maulana azizul haq there is no subsisting cause of action to proceed with the petition either by his heirs or any other person in view of the nature of the suit. accordingly the petition is dismissed

অর্থাৎ *"আমরা আরও মনে করি যে, একমাত্র আবেদনকারী মাওলানা আজিজুল হকের মৃত্যুর পর মামলার প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তার উত্তরাধিকারী বা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা পিটিশনটি এগিয়ে নেয়ার জন্য কোনও বিদ্যমান কারণ নেই। অতএব আবেদনটি খারিজ করা হল।"*

আরও লক্ষণীয় হল, রায়ের মধ্যে শাইখের সন্তানদেরকে থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পক্ষ বলা হয়েছে, যাদের এখানে ভূমিকা পালনের সুযোগ নেই। (চিত্র: পৃষ্ঠা ৬৪)

ওয়াকফ প্রশাসনে প্রকৃত কমিটি কর্তৃক নিজেদেরকে তালিকাভুক্তির আবেদন এবং এর বিরুদ্ধে দখলদারদের করা সকল মামলায় চূড়ান্ত পরাজয়:

জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া ওয়াকফ সম্পত্তির উপর অবস্থিত, যা সরকারী আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসক কার্যালয় থেকে তালিকাভুক্ত করার নিয়ম। এই তালিকাভুক্তি আইন অনুযায়ী জরুরী। ওয়াকফ করার তিনমাসের মধ্যে তালিকাভুক্তির আবেদন না করলে মুতাওয়াল্লীর বিরুদ্ধে জরিমানা ও জেলের বিধান আছে। এ বিষয়ে অনবহিত বা অসচেতন থাকায় ইতঃপূর্বে তালিকাভুক্ত করা হয়নি। ২০০১-এ দখলের ঘটনা ঘটায় এই তালিকাভুক্তি আরও জরুরী হয়ে যায়। কারণ এই দখলের প্রতিবিধান করার মূল কর্তৃপক্ষ ওয়াকফ প্রশাসন। যা ওয়াকফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ এর বিধান অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতার অধিকারী।

ওয়াকফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ এর ধারা (৪৭) উপধারা (৭) এ আছে,

'in the case of waqfs created before the date on which this Ordinance comes into force, the application for enrolment shall be made within three months from that date, and in case of waqfs created after that date within three months from the date of the creation of the waqf'

অর্থাৎ ওয়াকফ করার তিন মাসের মধ্যে তালিকাভুক্তির নিয়ম।

ওয়াকফ অধ্যাদেশ, ধারা (৬১) উপধারা (১) এর (অ) এবং (ঘ)-এ আছে,

if a mutawalli fails- (a) to apply for enrolment; or...to do any other act which he is lawfully required to do by or under this Ordinance; he shall, unless he satisfies the Court that there was reasonable cause for his failure, be punishable with fine which may extend to 18[twenty thousand] taka and, in default with simple imprisonment which may extend to six months:

অর্থাৎ মুতাওয়াল্লী তালিকাভুক্তির আবেদন না করলে তার জেল ও জরিমানার বিধান রয়েছে।

এছাড়া "ওয়াকফ কেন এবং কিভাবে করা যায়" নামক প্রবন্ধে মোঃ সোহরাব হোসেন ভূইয়া, এডভোকেট, জজকোর্ট, কুমিল্লা লিখেছেন–

"সম্পত্তি হস্তান্তর আইন-১৮৮২ এর বিধান মতে ওয়াকফকৃত স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ১০০ টাকার বেশী হলে তা রেজিষ্টী (ম. প্রা.) করা বাধ্যতামূলক। তবে অস্থাবর সম্পত্তি মৌখিকভাবেও ওয়াকফ করা যায়।" (প্রবাসীর দিগন্ত অনলাইনে প্রকাশিত: ১৮ জানুয়ারী ২০২০, ৯:২৯ পূর্বাহ্ন)

উল্লিখিত আইন ও বাস্তবতা বিবেচনায় প্রকৃত কমিটির পক্ষ থেকে ১০-০২-২০০২ খ্রি. তারিখে পরিচালনা কমিটির প্রতিষ্ঠাকালীন ও চলমান সভাপতি জনাব আলহাজ্ব আব্দুল মালেক সাহেব তালিকাভুক্তির আবেদন করেন। (এর মিস কেস নং ৩/২০০২)। তখন শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেবও ২৭.০৩.২০০২ তারিখে নিজেকে জামিআর সভাপতি দাবী করে তাঁকে মুতাওয়াল্লী ঘোষণার আবেদন দাখিল করেন।

ওয়াকফ প্রশাসন কর্তৃক প্রকৃত কমিটিকে বৈধ কমিটি হিসেবে তালিকাভুক্তি, দখলদারদের উচ্ছেদ অর্ডার এবং উচ্ছেদের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ:

অবশেষে ২১-০৭-২০০৭ খ্রি. তারিখে ওয়াকফ প্রশাসক বিস্তারিত তদন্ত সাপেক্ষে এবং দোতরফা বক্তব্য শুনে হাজী আহমদ ফজলুর রহমানকে মুতাওয়াল্লী ঘোষণা করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট বৈধ কমিটিকে তালিকাভুক্তির ঘোষণা করেন, (এর নিবন্ধন নং ১৯৫৮৮) পক্ষান্তরে শাইখুল হাদীস রহ.-এর আবেদনটি বাতিল করে দেন এবং তাদেরকে রাহমানিয়া ভবন থেকে উচ্ছেদ করার জন্য ডিসি ঢাকাকে পত্র প্রেরণ করেন, সে মতে ডিসি ঢাকা তাদেরকে উচ্ছেদ করার জন্য ২৯/৬/২০০৮ তারিখ আদেশ প্রদান করেন এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জনাব কামরুজ্জামানকে উচ্ছেদ কার্য পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ১০/৭/২০০৮ তারিখে উচ্ছেদ কার্যের দিন নির্ধারণ করেন। কিন্তু অজানা কারণে তিনি উচ্ছেদ কার্যক্রম করেননি। (চিত্র: পৃষ্ঠা ৫২)

ওয়াকফ প্রশাসকের আদালতে হেরে গিয়ে দখলদারগণ কর্তৃক পরপর বিভিন্ন আদালতে আপীল ও সকল আদালতে পরাজয়:

অপরদিকে দখলদারগণ ওয়াকফ প্রশাসক -এর আদালতে হেরে যাওয়ার পর বৈধ কমিটির তালিকাভুক্তির বিরুদ্ধে মাননীয় জেলা জজ বরাবর আপিল করেন। (মিস আপিল নং ৮৭/০৭) মাননীয় জেলা জজ দীর্ঘ শুনানীর পর ২৫-১০-২০০৭ খ্রি. তারিখে আপিলটি বাতিল ও নামঞ্জুর করেন এবং মাননীয় জেলা জজের আদেশটি বহাল রাখেন।

অতঃপর দখলদারগণ মাননীয় জেলা জজ-এর আদালতে হেরে যাওয়ার পর তাঁর রায়ের ১ম অংশের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন ৪৫৩৭/০৭ দায়ের করলে মহামান্য আদালত ২১-১১-২০০৭ খ্রি. তারিখে উক্ত আপীলটি খারিজ ও বাতিল করে দেন এবং জেলা জজের আদেশটি বহাল রাখেন।

অতঃপর দখলদারগণ জেলা জজ-এর চূড়ান্ত রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন ৫৭২২/০৭ দায়ের করেন, কিন্তু প্রকৃত ও আদালত কর্তৃক ঘোষিত বৈধ কমিটি মুভ করার পর তারা যখন দেখলেন যে, এ মামলায় নিশ্চিত হেরে যাবেন; তখন ০৭-০৮-২০০৮ খ্রি. তারিখে মামলাটি তুলে নিতে বাধ্য হোন।

এরপরও তারা থেমে থাকেননি, জেলা জজ কর্তৃক তাদের আপিলটি খারিজ হওয়ার পর এর বিরুদ্ধে তারা ১০-০৮-২০০৮ খ্রি. তারিখে সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগে রিট ৬০৯৮/০৮ করেন এবং দীর্ঘ শুনানীর পর গত ২০-০৮-২০০৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় বিচারপতি রিটটি খারিজ করে দেন এবং উচ্ছেদের অর্ডার বহাল রাখেন।

রিট খারিজ হওয়ার পর গত ০১-০৯-২০০৯ খ্রি. তারিখে তিনি সুপ্রিম কোর্টে (c.m.p) -র সিঙ্গেল বেঞ্চে আপীল করেন, মামলা নং ৬৮৪/০৯। ১৫-০৯-২০০৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় বিচারপতি পক্ষ-১ এর আপীলটি দোতরফা শুনানীর পর খারিজ করে দেন এবং উচ্ছেদ -এর অর্ডার বহাল রাখেন। (চিত্র: পৃষ্ঠা ৫৩)

সুপ্রিম কোর্টের ফুল বেঞ্চে দখলদারদের আপীল খারিজ ও চূড়ান্তভাবে উচ্ছেদ অর্ডার বহাল:

সুপ্রিম কোর্টে (c.m.p) সিঙ্গেল বেঞ্চে আপীলটি খারিজ হওয়ার পর তিনি মাননীয় প্রধানবিচারপতিসহ ছয়জন বিজ্ঞ বিচারক মহোদয়ের ফুল বেঞ্চে লিভ টু আপীল করেন। মামলা নং ১৬৬/২০১০ খ্রি.। ফুল বেঞ্চের বিজ্ঞ বিচারক মহোদয়গণ ১৮-০৭-২০১০ খ্রি. মামলাটি খারিজ করে উচ্ছেদ অর্ডার বহাল রাখেন। (চিত্র: পৃষ্ঠা ৫৪)

উচ্ছেদের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট ও সময় নির্ধারণ করা সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে তা বাস্তবায়িত না হওয়া:

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ডিসি কর্তৃক দুইবার উচ্ছেদ অর্ডার সত্ত্বেও এবং সে দুইবার উচ্ছেদের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের পর নিম্নোক্ত তারিখে (১০-০৭-২০০৮ খ্রি. যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ২৮-০৪-২০০৯ খ্রি.) ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ২৩-৭-২০০৭ এ জারিকৃত ওয়াকফপ্রশাসনের একই স্মারকপত্রের ভিত্তিতে উচ্ছেদের সময় নির্ধারণ সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। (চিত্র: পৃষ্ঠা ৫৬)

এ ব্যাপারে দখলদারদের অপব্যাখ্যা ও নিষ্পত্তি:

দখলদারদের তরফ থেকে বলা হয়ে থাকে যে, আদালতের স্থগিত আদেশের কারণে উক্ত উচ্ছেদ অর্ডার কার্যকর হয়নি। তাদের এ দাবী সঠিক নয়। কেননা, তাদের একথা যদি সত্য হতো তাহলে উচ্ছেদ অর্ডারের বিরুদ্ধে করা তাদের আপিল, রিভিশন ও রিটগুলো সব খারিজ হত না। এগুলো সব খারিজ হওয়াই এ কথার প্রমাণ যে, উচ্ছেদ অর্ডারগুলো অকার্যকর হওয়ার মত স্থগিত আদেশ ছিল না। আর এক্ষেত্রে যে স্থগিত আদেশের উদ্ধৃতি দখলদারগণ দিয়ে থাকেন তা মূলত বাদী তথা প্রকৃত কমিটির আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রকৃত কমিটির কার্যক্রম নির্বিঘ্নে পরিচালনার স্বার্থে দেওয়া হয়েছিল। (চিত্র: পৃষ্ঠা ৫৭)

জবরদখল ও উচ্ছেদ সংক্রান্ত একমাত্র মামলা, মামলার পরিণতি এবং দখলদারদের টালবাহানা:

উল্লেখ্য, জামিআ রাহমানিয়া বেহাত হওয়ার পর বৈধ কমিটি দখলদারদের বিরুদ্ধে চার ধরণের আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। **এক.** ওয়াকফ প্রশাসনে বৈধ কমিটিকে তালিকাভুক্তির আবেদন। **দুই.** দখলকারীদের ঘোষিত কমিটিকে অবৈধ ঘোষণার জন্য মামলা। **তিন.** দখলকালে বিভিন্ন ফৌজদারী অপরাধের বিরুদ্ধে মামলা। **চার.** দখলের প্রতিকার চেয়ে দেওয়ানী মোকাদ্দমা।

যাই হোক, ওয়াকফ প্রশাসনে তালিকাভুক্তি ও দখলকারীদের ঘোষিত কমিটিকে অবৈধ ঘোষণা সংক্রান্ত সকল মামলা নিষ্পত্তি হবার পরও ওয়াকফ প্রশাসন তৃতীয়বার উচ্ছেদ আদেশ দিতে টালবাহানা করে। অপরদিকে জবরদখলকারীদের অবৈধ দখলের মেয়াদ ১২ বছরে উপনীত হয়। ফলে তামাদী আইনে মামলা বারিত হবার অবস্থা তৈরি হওয়ার আগেই বৈধ কমিটির তরফ থেকে জজকোর্টে আরেকটি মামলা করা হয়। (দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ১০১৪/২০১২)। এই মামলার আর্জিতে মূলত একথাটি লেখা হয় যে, ওয়াকফ সম্পত্তিটি দখলদারগণ অন্যায়ভাবে জবরদখল করেছে। পূর্বের মামলায় কোর্টের রায়ে তাদের কমিটি অবৈধ ঘোষণা সত্ত্বেও এবং ওয়াকফ প্রশাসনের তালিকাভুক্তি ও অবৈধ কমিটিকে উচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলাগুলো নিষ্পত্তি হবার পরেও তাদেরকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে না। এ বিষয়ে আদালতের কাছে ডিক্রি চাওয়া হয়। সেমতে আদালত ডিক্রি জারী করে এবং তাদের উচ্ছেদের জন্য ৬০ দিন সময় বেঁধে দেয়। এই মামলাটি দায়ের করতে বৈধ কমিটি মূলত দুটি কারণে বাধ্য ছিল –

১. ১২ বছর পার হওয়ায় তামাদি আইনে বারিত হবার পরিস্থিতি তৈরি হওয়া। উক্ত মামলার আরজিতে লেখা হয়, "এদিকে যেহেতু বিবাদীগণ গত ৩/১১/২০০১ তারিখে বাদীকে নালিশী সম্পত্তি হইতে বেদখল করিয়াছে, সেইহেতু ১২ বৎসর সময় মধ্যে উচ্ছেদের মোকদ্দমা না করিলে তামাদি আইনে বারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় বাদী বাধ্য হইয়া আদালতে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিতে বাধ্য হইলেন।"

২. রাজনৈতিক লিয়াজোঁ করে পূর্বোল্লিখিত দুটি মামলার রায়ের দাবী অনুযায়ী উচ্ছেদ অর্ডারকে আটকে রাখা। একটি বৈধ আইনগত অধিকার যখন অবৈধ রাজনৈতিক লিয়াজোঁ করে আটকে রাখা হয় তখন তার সমাধানের জন্য দেশীয় আইনের রীতিমতে আইনী পন্থা অবলম্বন ছাড়া উপায় থাকে না।

এই মামলাতেও দখলদারগণ সময়ক্ষেপণের সুযোগ নেয়। তারা মামলার সমন পায়নি দাবী করে পরবর্তীতে একটি মিস মোকদ্দমা করে, যার নং ৬৮/২০১৫। এভাবে তারা সময়ক্ষেপণের পথ গ্রহণ করে। মূলত বৈধ কমিটির এই মামলা করার দরকারই ছিল না যদি ওয়াকফ প্রশাসনের তালিকাভুক্তি ও উচ্ছেদ অর্ডারকে ঠিক রেখে দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের রায় যথাসময়ে বাস্তবায়ন হতো। পরবর্তীকালে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে এসে সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী ওয়াকফ প্রশাসন উচ্ছেদের আদেশ জারী করায় এবং উল্লিখিত মামলার বাদী মৃত্যুবরণ করায় মামলাটির প্রয়োজন আর বাকি থাকেনি; ফলে বৈধ কমিটি মামলাটি তুলে নেয়।

পরিশেষে যথাযথ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ওয়াকফ প্রশাসন থকে সর্বশেষ উচ্ছেদ অর্ডার ও উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা

২০২১ সনের ২৬শে মার্চে ও তার আগে-পরে সরকার যখন দখলদারদের ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলো খুঁজে খুঁজে বের করতে গিয়ে জানতে পারে যে, তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলার রায় হয়ে আছে। অর্থাৎ একদিকে তাদের কমিটি সর্বোচ্চ আদালতে অবৈধ ঘোষিত হয়েছে অন্যদিকে ওয়াকফ প্রশাসনের উচ্ছেদ আদেশগুলো সকল পর্যায়ের আদালতে সমর্থিত হয়ে আছে, যদিও দখলদারগণ রাজনৈতিক ছল-চাতুরির বলে ওয়াকফ প্রশাসনের তৃতীয়বার উচ্ছেদ আদেশ আটকে রেখেছিলো। সরকার বিষয়টি জানতে পেরে আইনকে স্বাভাবিক চলার ক্ষেত্রে দখলদারগণ যে বাধা সৃষ্টি করে রেখেছিল তা তুলে নেয় এবং স্বাভাবিক গতিকে চলতে উৎসাহিত করে। অতএব ওয়াকফ প্রশাসন বৈধ কমিটির বর্তমান মুতাওয়াল্লী ও সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুর রহীম কর্তৃক দাখিলকৃত ১০/১২/২০২০ এর কমিটি তালিকাভুক্তির আবেদন বিবেচনায় নেয়। (লক্ষণীয় যে, এই তালিকাভুক্তির আবেদন প্রতি তিনবছর পর পর করতে হয় এবং সেই রুটিন অনুসারেই এই আবেদন করা হয়েছিল। আরও উল্লেখ্য যে, আবেদনের তারিখ লক্ষণীয়: এটি ডিসেম্বর ২০২০ এ করা হয়েছিল অর্থাৎ ২০২১ এর মার্চে সরকার দখলদারদের উপর রুষ্ট হবার অনেক আগের আবেদন।)

সে সাথে আরো বিবেচ্য হয় মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং ৭৭৪৯ এর গত ০৪/০৫/২০২১ তারিখের আদেশ। আরো বিবেচ্য হয় ২৮/০৪/২০২১ এ ওয়াকফ পরিদর্শকের তদন্ত প্রতিবেদন। এই সব কিছুর বিবেচনায় ১৮/০৫/২০২১ খ্রি. তারিখ হতে তিন বছরের জন্য

প্রকৃত কমিটিকে ওয়াকফ প্রশাসন কর্তৃক অনুমোদন দেওয়া হয়। (চিত্র: পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯)

এই অনুমোদনের পরও দখলদারগণ বিভিন্নভাবে লিয়াজোঁর চেষ্টা করে। ফলে তালিকাভুক্তি সত্ত্বেও উচ্ছেদ হচ্ছিল না। বরং আগের মতোই কালক্ষেপণ করা হচ্ছিল। অতঃপর ২৪/০৬/২০২১ তারিখে বৈধ কমিটির মুতাওয়াল্লী ও সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুর রহীম উচ্ছেদের আবেদন করে ওয়াকফ প্রশাসনে দরখাস্ত করেন। এই আবেদন বিবেচনায় নিয়ে ওয়াকফ প্রশাসক ২৯/০৬/২০২১ তারিখে মাদরাসা বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। (চিত্র: পৃষ্ঠা ৬০) এরপর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. আব্দুল আওয়ালকে ১৯ জুলাই ২০২১ সকাল দশটায় উচ্ছেদের জন্য সময় নির্ধারিত করে নিয়োগ করা হয়। (চিত্র: পৃষ্ঠা ৬১) এবং দীর্ঘ ইতিহাস তৈরির পর পরিশেষে দখলদারদের উচ্ছেদ কার্যকর হয়। বর্তমানে মাদরাসাটি বৈধ পরিচালনা কমিটির দায়িত্বে সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য এ পর্যায়ে অনেকে বলে থাকেন যে, ইতোপূর্বে কেউ কেউ মাদরাসাটিকে দুভাগ করে মীমাংসা করে নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। কেউ কেউ মুফতী সাহেবকে সন্ধি করে নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল বলে দাবী করেন এবং বলেন যে, প্রস্তাবগুলোকে কেন আমলে নেয়া হলো না? আবার কেউ কেউ বলেন যে, মুফতী সাহেব শাইখপরিবারের এ মজলুমিয়্যাতের সময়ে কেন মাদরাসাটি বুঝে নিতে গেলেন, নিজেরা তো ১০ তলা একটা মাদরাসা করেছেনই তারপরও এটাকে নেয়ার দরকার হল কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখানে এ বাস্তবতা বুঝতে হবে যে, এটা কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যে, চাইলেই নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়ে ভাগাভাগি করে নিবে; বরং এটা ওয়াকফ সম্পত্তি। শরীয়তের নীতি ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ওয়াকফ সম্পত্তি ন্যায়ানুগভাবে পরিচালনা করার অধিকার মুতাওয়াল্লীর উপর বর্তায়। আর রাহমানিয়ার জমির ওয়াকিফ এ দায়িত্ব রাহমানিয়ার কমিটির হাতে অর্পণ করেছেন।[৩]

সুতরাং রাহমানিয়ার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অব্যাহতভাবে নবায়নকৃত এবং দখলের আগে সর্বশেষ ২৮-০৪-২০০০ সনে সাধারণ পরিষদের মজলিসে নবায়নকৃত কমিটিই ছিলো এর বৈধ পরিচালক। সে হিসেবে এখানে একমাত্র করণীয় হলো পরিচালনা কমিটির হাতে মাদরাসাটি তুলে দেওয়া। কারণ তারাই এর শরীয়তসম্মত পরিচালক।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, মূল দ্বন্দটা এখানে কিন্তু শাইখ আর মুফতী সাহেবের মধ্যে নয় বরং পরিচালনা কমিটি এবং শাইখের মধ্যে। সুতরাং মুফতী সাহেব এবং শাইখের মধ্যে সমাধান হয়ে যাওয়াই এখানে সমাধান নয়। মুফতী মনসূরুল হক সাহেব বলেন, ২০০০ সনে যখন পরিচালনা কমিটির সাথে শাইখের দ্বন্দ্ব হয়, তখন কোনো কোনো আলেম বিশেষত গহরডাঙ্গার হযরত কাশিয়ানী হুজুর রহ. মুফতী মনসূরুল হক সাহেবকে বলেছিলেন সরে যাওয়ার জন্য। তখন মুফতী সাহেব হযরত হারদুয়ী রহ.-এর সাথে পরামর্শ করেন। তখন হারদুয়ী হযরত জিজ্ঞাসা করেন, তুমি সরে গেলে কি রাহমানিয়ার সমস্যা মিটে যাবে?! মুফতী সাহেব তখন চিন্তাভাবনা করে বললেন যে, আমি সরে গেল রাহমানিয়ার সমস্যা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখি না। কারণ সমস্যা মূলত কমিটির সাথে শাইখ রহ.-এর; আমি সরে গেলেও তারা তো আছে। তখন হারদূয়ীর হযরত মুফতী সাহেবকে সরতে নিষেধ করেন।

হারদূয়ীর হযরতের এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে– মুফতী সাহেবদের জন্য জবরদখলকারীগণ কর্তৃক জবরদখলের পূর্বে এখান থেকে সরে যাওয়া বা দখলপরবর্তীতে তাদের সঙ্গে সন্ধি করে মাদরাসা ভাগাভাগি করে নেওয়া; কোনোটারই সুযোগ ছিলো না।[৪]

আর ২০২১ সালে শাইখপরিবারের মজলুম হওয়া না-হওয়ার সঙ্গে ২০০১ সালের সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে ও সন্ত্রাসী কায়দায় জবরদখল করে নেয়া ওয়াকফ সম্পত্তির দাবী ছেড়ে দেয়ার কী সম্পর্ক? জবরদখলের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাগুলো কি ২০২০ সালের ২৬ ডিসেম্বরের পরের, নাকি ২০০১ সালের জবরদখলের পরের? যদি ২০০১ সালের দখলকাণ্ডের পরের হয়ে থাকে তাহলে বৈধ কমিটির পক্ষে প্রদত্ত মামলার রায়গুলো বিবেচনায় না নিয়ে সরকারী সহায়তার অপবাদ দেয়া কতটুকু যুক্তিসংগত? উপরন্তু যে সকল মন্ত্রের বলে একাধিকবারের উচ্ছেদ অর্ডার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পরও কার্যকর হতে পারেনি সেগুলোতে কি রাজনৈতিক আঁতাতের কোন গন্ধ ছিল না? কথা আরও আছে– ২০০১ সালের ৩রা নভেম্বর সন্ত্রাসী কায়দায়জবরদখলের ক্ষেত্রে শাইখপরিবারের দ্বারা যারা চরমভাবে মজলুম হয়েছিলেন, ২০২১ সালে এসে শাইখপরিবারের প্রতি দয়া প্রদর্শনের কর্তব্যও কি সেই মজলুমদের দায়িত্বে বর্তায়? অথচ, শাইখপরিবারের বর্তমানের মজলুম হওয়া না-হওয়ার সঙ্গে মুফতী মনসূরুল হক সাহেব বা জামিআ রাহমানিয়া কর্তৃপক্ষের কোন দূরতম সম্পর্কও নেই।

উচ্ছেদ কার্যক্রম ও উচ্ছেদ-পরবর্তী বিভিন্ন প্রসঙ্গ

অতঃপর ১৯ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ সোমবার, সকাল আটটার দিকে মাওলানা মাহফূজুল হক সাহেব রাহমানিয়ার ভেতরে থাকা শিক্ষক-ছাত্রদেরকে সঙ্গে নিয়ে মাদরাসার গেটে উপস্থিত হন। এসময় তিনি উপস্থিতিদের উদ্দেশে একটি আবেগঘন বক্তব্য দেন। বক্তব্যের সারকথা ছিলো, নিয়মতান্ত্রিক কোন নোটিশ না পাওয়া সত্ত্বেও মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর টেলিফোনের ভিত্তিতে তারা মাদরাসার চাবি হস্তান্তর করতে যাত্রাবাড়ির হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেব দা.বা.-এর নিকট যাচ্ছেন এবং আপাতত প্রতিষ্ঠানটি ছেড়ে যাচ্ছেন। তাঁর এ বক্তব্যের ভিডিও অনলাইনে ভাইরাইল হয়েছে। এই বক্তব্য প্রদানের পর তিনি মাদরাসার সকল গেটে তালা লাগিয়ে মাদরাসা ত্যাগ করেন।

মাওলানা মাহফূজুল হক সাহেবের মাদরাসা ত্যাগের ঘন্টাদুয়েক পর জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশফোর্স এবং সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ মাদরাসার গেটে উপস্থিত হন এবং পুরো স্থানটি কর্ডন করে জনসাধারণের চলাচল বন্ধ করে দেন। এ সময় তারা উপস্থিত সাংবাদিক এবং জনসাধারণকে ছবি তোলা ও ভিডিও ধারণের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। কিন্তু কিছু কিছু ছাত্র–যাদের মধ্যে মাওলানা মাহফূজুল হক সাহেবের মাদরাসার ছাত্ররাও যেমন ছিল, তেমনি মুফতী সাহেবদের মাদরাসার ছাত্ররা ছিল–গোপনে

---

৩. উল্লেখ্য, ওয়াকফ জমি দেখভাল ও পরিচালনার দায়িত্ব যাকে দেওয়া হয়; তাকে শরয়ী পরিভাষায় মুতাওয়াল্লী বলা হয়। আর গঠনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে মাদরাসার কমিটিকে এই জমির দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং গঠনতন্ত্রে মুতাওয়াল্লীর কোনো কথা নেই; এই দাবী শাব্দিক মারপ্যাচ ছাড়া কিছুই নয়।

৪. এক্ষেত্রে কেউ কেউ বলেন, কমিটি/ মুফতীসাহেব পক্ষের ایثار তথা অপরকে প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমে মাদরাসাটি ছেড়ে দেওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু ایثار তো ব্যক্তিগত বিষয়ে হয়; ওয়াকফ সম্পত্তিতে হয় না, যেমনটি আগেও বলা হয়েছে।

ও কৌশলে ছবি তোলা ও ভিডিও ধারণের চেষ্টা করে। আশেপাশে সিভিলবেশে থাকা গোয়েন্দারা তাদেরকে পাকড়াও করে কাউকে ধমক দিয়ে ছেড়ে দেয় এবং কয়েকজনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মাওলানা মাহফুজুল হক সাহেবদের কয়েকজন ছাত্র ছিল এবং মুফতী সাহেবদের মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র আব্দুল্লাহও ছিল। অবশ্য উচ্ছেদ কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর বিকেলে ও রাতের দিকে তাদের সকলকে ছেড়ে দেয়া হয়।

যাই হোক, সরকারী লোকজন এসে মাদরাসার গেটে তালা ঝুলানো দেখে এবং গেটে সাঁটানো একটি কাগজ দেখতে পেয়ে চাবি সংগ্রহের জন্য পরিচালনা কমিটির উপস্থিত লোকজনের কাছে মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেবের ফোন নম্বর অনুসন্ধান করেন। কমিটির সদস্যগণ তাদেরকে মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেবের পুত্র বা জামাতার নম্বর প্রদান করেন। অতঃপর সরকারী লোকজন পুত্র বা জামাতার মাধ্যমে মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি এখনও চাবি হাতে পাননি বলে অবগত হন। অতঃপর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মাদরাসার গেটে সাঁটানো কাগজটির আইনী ভিত্তি না থাকায় এবং সেখানে কারও দস্তখত না থাকায় উপরন্তু বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করে অবশেষে উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করেন। চাবি না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই তারা ইলেক্ট্রিক কাটারের মাধ্যমে গেটগুলোর তালা কাটতে থাকেন। মাদরাসার প্রধান গেটের তালা কাটার পর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মাদরাসার পরিচালনা কমিটির সভাপতি জনাব আব্দুর রহিম সাহেব এবং একজন শিক্ষক মাওলানা উবাইদুল্লাহ হাজারী সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। অতঃপর একইভাবে মাদরাসার সকল গেট ও সকল কামরায় ঝুলানো তালা কাটা হয় এবং প্রতিটি কামরায় থাকা সামানপত্রের তালিকা করা হয়। (উল্লেখ্য, মাদরাসার তালা কাটার সময় এক ব্যক্তি পুলিশকে কোন সংস্থার লোক বলে পরিচয় দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে এবং তালা কাটার ছবি তুলে অনলাইনে ভাইরাল করে দেয়। পুলিশ ব্যাপারটি টের পেরে আরও কঠোরতা অবলম্বন করে এবং আশপাশের ভবন থেকে ছবি তুলতে থাকা লোকজনকেও চিহ্নিত করে করে সতর্ক করে দেয়।)

উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর পাঁচতলা ভবনের সকল তলার সমস্ত সামানার তালিকা করতে করতে দুপুর পেরিয়ে যায়। এদিকে উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করার আগে আগে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পরিচালনা কমিটির দায়িত্বশীলদের পাশাপাশি কমিটি নিযুক্ত মুহতামিম মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবকেও ঘটনাস্থলে ডেকে নেন। অতঃপর উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর মুফতী মনসূরুল হক সাহেবসহ অন্যান্য শিক্ষকদেরকেও ডেকে আনা হয়। উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা সকলে মাদরাসার পার্শ্ববর্তী নূরানী তালীমুল কুরআন ওয়াকফ এস্টেটের টিনশেডে অবস্থান করেন। অতঃপর উচ্ছেদ কার্যক্রম সমাপ্ত হলে বিকেল তিনটা সাড়ে তিনটা নাগাদ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পরিচালনা কমিটির সভাপতির নিকট মাদরাসা বুঝিয়ে দেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ও সভাপতি সাহেব উভয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। অতঃপর পুলিশের বড় অংশটি স্থান ত্যাগ করে এবং একজন পুলিশ অফিসার মুফতী সাহেবদের নিকট বলে যান যে, "হুযুর! আমাদেরকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তা-তো আমরা পালন করলাম। কিন্তু আপনাদের চারপাশে কালনাগিনীর নিঃশ্বাস বইছে। কাজেই খুব সতর্ক থাকবেন।"

যাই হোক, সভাপতি সাহেব মাদরাসা বুঝে নেয়া এবং সাংবাদিকদের প্রশ্নাবলীর উত্তর দেয়ার পর বিকেল চারটা নাগাদ নূরানী তালীমুল কুরআন ওয়াকফ এস্টেটের টিনশেডে অবস্থানরত শিক্ষকবৃন্দ, কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, এই প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করা বেশকিছু প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমান ছাত্রবৃন্দকে নিয়ে মাদরাসার গেটে উপস্থিত হন এবং মুরুব্বী শিক্ষকদেরকে ভেতরে প্রবেশ করে মাদরাসার কার্যক্রম জারী করার আহ্বান জানান। এটি ছিল এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত এবং ২১ বছরের দুআ, কান্নাকাটি ও আল্লাহর সমীপে রোনাজারীর ফলাফল। অতঃপর উপস্থিত সকলে বিনয় ও নম্রতার সাথে আল্লাহ তাআলার মৌখিক শোকরিয়া আদায় করতে করতে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং মাদরাসার মাঝ বরাবর সিঁড়িটি ব্যবহার করে চারতলার মিলনায়তনে উপস্থিত হন। চারতলায় পৌঁছার পর মুরুব্বী শিক্ষকগণ উপস্থিত সকলকে আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায়ার্থে দুই রাকাত নামায আদায়ের নির্দেশ দেন। নামায শেষে উপস্থিতিগণ চারতলার মাঝামাঝি সিঁড়ি বরাবর পশ্চিমমুখী হয়ে বসেন। অতঃপর কুরআনে কারীম তিলাওয়াতে মাধ্যমে শোকরানা বয়ান শুরু হয়। মুফতী সাহেব হুযূর মক্তব থেকে দাওয়ায়ে হাদীস পর্যন্ত এই মাদরাসার অধীনে পড়াশোনা করেছে এমন কোন ছাত্রকে তিলাওয়াত করতে বলেন। সে মতে একজন ছাত্র প্রথমে সূরা নাছর, অতঃপর সূরা বনী ইসরাঈলের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করেন। আরেকজন প্রাক্তন ও সুযোগ্য ছাত্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে মুরুব্বী শিক্ষকগণ ও কমিটিবৃন্দ তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন এবং আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায় করত উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষকদেরকে মাদরাসার সর্বসম্মত কানুনসমূহের অনুগামী থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। এভাবে প্রায় নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তাআলার এবং স্রেফ আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে দীর্ঘ একুশ বছরের কাঙ্ক্ষিত পুনরুদ্ধার কর্ম অত্যন্ত আসানীর সাথে নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়।

অতঃপর পুলিশ অফিসারের সেই সতর্কতা আমলে নিয়ে ঐ রাত থেকেই মুহাম্মাদপুর থানা থেকে পুলিশী নিরাপত্তার আবেদন জানানো হয় এবং নিয়মতান্ত্রিকতা অনুসরণ করে দুই মাসের মতো পুলিশী প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়।

আন্তরিকতা ও যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করত সামানপত্র প্রদান

আদালতের রায় বাস্তবায়ন করত দখলদারদের উচ্ছেদ করার পর উচ্ছেদকৃতদের রেখে যাওয়া ব্যক্তিগত সামানপত্র আমানতদারীর সঙ্গে হস্তান্তর করা ছিল বড় একটি চ্যালেঞ্জ। এ ব্যাপারে জামিআ কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং কিছু নিয়মনীতি প্রণয়ন করত সামানপত্র হস্তান্তর কার্যক্রম আরম্ভ করে। সামানপত্র হস্তান্তরের ক্ষেত্রে রাহমানিয়ার ছাত্র-শিক্ষকগণের ব্যাপক সহযোগিতার ব্যাপারে সামানাগ্রহণকারীদের অনেকেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। অতঃপর আল্লাহর মেহেরবানীতে অল্পদিনের মধ্যেই সামানপত্র হস্তান্তরের কাজ সমাপ্ত হয়।

উল্লেখ্য, সামানপত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে শুধু ব্যক্তিগত সামানা নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই "মাদরাসার সামানা" নিয়ে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। শুরুর কয়েকদিন সামানা গ্রহণকারীগণ যেটাকেই নিজেদের সামানা বলে উল্লেখ করেছেন সেটাই তাদেরকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কয়েকদিন পর লক্ষ্য করা গেল, একজন সামানা গ্রহণকারী মাদরাসার সিল দেয়া কিতাবপত্রও নিজের বলে বাক্সে ভরছেন, আবার মাদরাসার মালিকানাধীন অন্যান্য বুকশেলফের মতো একই ধাঁচে ও রঙ দিয়ে নাম্বারিং করা এবং একই মাপ ও ডিজাইনের

বৃকশেলফটিকে ব্যক্তিগত বলে ট্রাকে উঠিয়ে নিচ্ছেন। আরেকজন দেয়ালে স্থাপিত বিশাল আকারের জুতোর বাক্সটিকে ব্যক্তির জন্য ওয়াকফকৃত বলে দাবী করছেন। এরপর থেকে কর্তৃপক্ষ আরও সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং যেসব সামানা নিশ্চিতভাবেই মাদরাসার সম্পদ বলে চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলো প্রদান করা থেকে বিরত থেকেছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, পরবর্তী সময়ে এমন এক ব্যক্তি নিজের সামানা পুরোপুরি বুঝে না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন, যাকে তার ঝুটাপানির বালতি এমনকি কাটা-ঝুটা ফেলার দশটাকা মূল্যের পুরনো পাত্রটিও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তিনি সকল সামানা বুঝে পেয়েছেন মর্মে নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রারে স্বাক্ষরও করে গেছেন।

হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেবের রাহমানিয়া ভবনে আগমন:

দখলমুক্তির সংবাদ পেয়ে রাহমানিয়ার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শারীরিকভাবে মাজুর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পরিচালনা কমিটির অন্যতম সদস্য, বর্তমানে পরিচালনা কমিটির বিশিষ্ট উপদেষ্টা হযরত প্রফেসর সাহেব দা.বা. রাহমানিয়া ভবন পরিদর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন এবং গাড়ির অপেক্ষা না করেই বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েন। রাহমানিয়ায় তাশরীফ আনার পর বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি হেঁটে হেঁটে তিনতলায় উঠে পড়েন। মুফতী সাহেব, মুমিনপুরী সাহেব ও অন্যান্য উস্তাদদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি স্মৃতিকাতর ও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন এবং অশ্রুসিক্ত হন। উল্লেখ্য, তিনি রাহমানিয়ার বৈধ কমিটিকে সর্বদা সমর্থন করে এসেছেন এবং নিজেকেও কমিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখেছেন।

দুটি অভিযোগ ও তার জবাব

অভিযোগ-১: মুফতী মনসূরুল হক সাহেব মাদরাসার দখল বুঝে পাওয়ার পর চারতলায় প্রদত্ত বক্তব্যে জিহাদকে অস্বীকার করেছেন এবং মাহফুজুল হক সাহেবদেরকে জঙ্গী বলেছেন।

খণ্ডন: প্রথমে মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের বক্তব্যটি হুবহু দেখে নিই। তিনি বলেছিলেন–

"তৃতীয় কথা হলো, এখন আল্লাহ তাআলা আমাদের হাতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এটার শুকরিয়া এই যে, এটাকে– এখানে তো নায়েবে রাসূল তৈরি করা হবে। রাসূলদের তিন কাজ ছিল। তাবলীগ, তা'লীম, তাযকিয়া। এই তিন কাজের জন্য এই ভবন ব্যবহার হবে। কোন ছাত্ররাজনীতি ওয়াগায়রা ওয়াগায়রা জঙ্গী তৎপরতা এগুলোর কোন ইজাযত তোমাদের নেই। কারও নেই এখানের কারও নেই। যে করবে সে বহিষ্কার হয়ে যাবে।"

এটা ছিল ২৩ মিনিট ৪৮ সেকেন্ডের বয়ানের ১৮ মিনিট ১৪ সেকেন্ড থেকে ১৮ মিনিট ৫৪ সেকেন্ডের বক্তব্য। এবার মূল কথায় আসা যাক–

(ক) কারও কারও আপত্তি হলো, তিনি তিনটির কথা কেন বললেন এবং জিহাদের কথা কেন বললেন না! তো এ ব্যাপারে কুরআনে কারীমের সূরা জুমুআর ২ নং আয়াতটির তরজমা দেখে নিলেই এর উত্তর মিলে যাবে। সেখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথিবীতে প্রেরণের উদ্দেশ্য ও তাঁর দায়িত্বাবলী স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন এবং উল্লিখিত তিনটি দায়িত্বের কথাই বর্ণনা করেছেন। রইল জিহাদের কথা উল্লেখ না করার বিষয়; তো কুরআনের অন্যান্য জায়গায় শত শত আয়াতে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তাছাড়া উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা জিহাদের পাশাপাশি রাষ্ট্রপরিচালনা, দণ্ডবিধি কায়েমসহ আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ বিধিবিধান উল্লেখ করা হয়নি, তাই বলে কি সেগুলো গুরুত্বহীন বিবেচিত হয়েছে? হয়নি। সুতরাং মুফতী সাহেবের বর্ণনাভঙ্গির প্রতি যদি আপত্তি হয় তাহলে কুরআনের বর্ণনাভঙ্গির ব্যাপারে আপত্তিকারীগণ নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করলে ভালো হয়!

(খ) "জঙ্গি তৎপরতা চলবে না" একথার দ্বারা তিনি জিহাদকে অস্বীকার করেছেন এটা সম্পূর্ণ গলত কথা। বস্তুতঃ এর দ্বারা তিনি মাদরাসার অভ্যন্তরে এগুলোর গলদ ব্যবহার চলবে না বোঝাতে চেয়েছেন। আর নির্দিষ্ট কার্যক্রম চালানোর উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে তার অধীনস্তদেরকে নিষেধ করার এক্তিয়ার রাখে।

(গ) মুফতী সাহেবের বর্ণিত শব্দ হল, "জঙ্গি তৎপরতা চলবে না"; তো সমালোচনার ক্ষেত্রেও হুবহু এই শব্দ উল্লেখ করার দরকার ছিল। "জঙ্গি তৎপতার " শব্দের স্থলে জিহাদ শব্দ উল্লেখ করার মতো খেয়ানত এবং এ ব্যাপারে ভিডিও বানিয়ে প্রচার করা বিলকুল অসভ্যতা।

(ঘ) জঙ্গি তৎপরতা আর জিহাদ শব্দদ্বয় দ্বারা ইসলামবিরোধীরা একই মর্ম উদ্দেশ্য নেয় এবং তারা দুটো বিষয়েরই প্রচণ্ড বিরোধী– একথা সত্য; কিন্তু চলমান বাস্তবতা ও বিশ্বপরিস্থিতির নিরিখে একজন সচেতন আলেম নিজস্ব পরিমণ্ডলে অবশ্যই দুটোর মধ্যে পার্থক্য করতে বাধ্য হবেন। কেননা নিয়মনীতি বর্হিভূত প্রাণহানী যথা হোলিআর্টিজানের মতো কর্মকাণ্ডকে কিভাবে সুন্নাহসম্মত জিহাদ বলা যেতে পারে; যদিও সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত লোকেরা নিজেদের কর্মকাণ্ডকে জিহাদ আর প্রাণদানকে শাহাদাত মনে করেছিল! তা-সত্ত্বেও যেসব আপত্তিকারীর মতে জিহাদ আর জঙ্গি তৎপরতা একই জিনিস তারা কি নিজেদের প্রতিষ্ঠানসমূহে "এখানে জঙ্গি তৎপরতা চালানো হয়" লিখিত সাইনবোর্ড ঝোলানোর হিম্মত রাখেন?

অভিযোগ-২: মুফতী সাহেব "ওয়াকুল জাআল হাক্বু ওয়াযাহাকাল বাতিল" আয়াত পড়ে নিজেদেরকে হক বলেছেন আর মাহফূজ সাহেবদেরকে বাতিল বলেছেন। তো মাদরাসা নিয়ে ইখতিলাফ প্রসঙ্গে তিনি একজন আলেমকে কিভাবে কাফের বলতে পারলেন, বা কাফেরের পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারলেন?

খণ্ডন: (ক) মুফতী সাহেব নিজে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে বক্তব্য শুরু করেননি। তিলাওয়াত করেছিল, একজন ছাত্র; সুতরাং এর দায় তো তাঁর নয়। হ্যাঁ, তিনি তার বক্তব্যর মাঝে, "ঐ যে একজন ওয়াকুল জাআল হাক্বু তিলাওয়াত করল না!" বলে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলেছেন।

(খ) তিনি নিজে এই আয়াত তিলাওয়াত করে বক্তব্য শুরু করলেও আপত্তির কিছু ছিল না। কেননা, আয়াতে উল্লিখিত "হক" আর "বাতিল" দ্বারা শুধু "ঈমান" আর "কুফর" উদ্দেশ্য ব্যাপারটি এমন নয়। হ্যাঁ, বেশিরভাগ মুফাসসির সংশ্লিষ্ট আয়াতে উল্লিখিত হক-বাতিল শব্দদ্বয় দ্বারা ঈমান-কুফর উদ্দেশ্য নিয়েছেন বটে, কিন্তু সব মুফাসসিরই এই উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা নয়। আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী রহ. লিখিত তাফসীরে তাবারীর এই আয়াতের অধীনে বর্ণিত নিম্নলিখিত বাক্যগুলো লক্ষ করুন–

الحق قد جاء وهو كل ما كان لله فيه رضا وطاعة وأن الباطل قد زهق
يقول وذهب كل ما كان لا رضا لله فيه ولا طاعة

(অর্থ:) **হক এসেই পড়েছে।** আর তা হলো প্রত্যেক ঐ জিনিস, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আনুগত্য বিদ্যমান থাকে। **আর বাতিল দূরীভূত হয়েছে।** আর তা হলো প্রত্যেক ঐ জিনিস যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আনুগত্য বিদ্যমান থাকে না।

তাফসীরে তাবারীতে উল্লিখিত হক-বাতিলের এই ব্যাখ্যার আলোকে একজন মুমিন ব্যক্তিকেও তার নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডের কারণে বাতিল বলার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

তাছাড়া এই আপত্তিকারীগণ হয়তো জানেনই না যে, এই মাওলানা মাহফূজুল হক সাহেবগণই ইতোপূর্বে মুফতী মনসূরুল হক সাহেব ও মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবদের নামে ভারী অস্ত্র নিয়ে, বোমা ফাটিয়ে রাহমানিয়া ভবনবাসী (অর্থাৎ মাহফূজুল হক সাহেবদের)-কে আতংকিত করার অভিযোগ তুলে একাধিকবার আদালতে মামলা করেছিলেন এবং যে মামলার ফলে মুফতী সাহেব ও হিফজুর রহমান সাহেবের নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি হয়েছিল ফলে হাইকোর্ট থেকে তাদেরকে জামিন নিতে হয়েছিল। এই ইতিহাস জানা থাকলে মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের বক্তব্যে এতো আপত্তি অনুসন্ধানের কসরৎ করা থেকে তাঁরা হয়তো বেঁচে যেতেন!

একটি প্রশ্নের জবাব ও আখেরী কালাম

কেউ মনে মনে ভাবেন, কেউ মুখ ফুটে বলেন, এমনকি সমমনাদেরও কারও কারও আশংকা– সরকারের পরিবর্তন ঘটলে বা কেউ মুক্তি পেলে বর্তমান কর্তৃপক্ষের জন্য রাহমানিয়া ধরে রাখা সম্ভব হবে না। এ ব্যাপারে রাহমানিয়া কর্তৃপক্ষের মনোভাব হল, রাহমানিয়া পুনরায় হাতছাড়া হওয়ার দুটি পন্থা হতে পারে– ১৯/০৭/২০২১ খ্রিস্টাব্দে যেভাবে বৈধ পন্থায় সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের মাধ্যমে প্রশাসন কর্তৃক ২০০১ খ্রিস্টাব্দের দখলদারদেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, কেউ ঠিক সেভাবে বৈধ পন্থায় সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের মাধ্যমে প্রশাসন কর্তৃক রাহমানিয়া কর্তৃপক্ষকে উচ্ছেদ করিয়ে ভবনের দখল বুঝে নিবে। এমনটি হলে রাহমানিয়া কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেটের হাতেই চাবি বুঝিয়ে দিয়ে প্রস্থান করবে। কিন্তু ২০০১ সালের অবৈধ দখলদারগণ উল্লিখিত পন্থায় আদালতের রায় নিয়ে সম্পূর্ণ আইনী প্রক্রিয়ায় কোনদিন আসতে পারবেন এমন আশংকা রাহমানিয়া কর্তৃপক্ষের নেই।
দুই. ২০০১ খ্রিস্টাব্দের মতো অবৈধ উপায়ে সন্ত্রাসী কায়দায় বোমাবাজি ও তাণ্ডব সৃষ্টি করে জবরদখল করবে। তো এভাবে অবৈধ উপায়ে সন্ত্রাসী কায়দায় জবরদখলকর্ম যে ভালো ফল বয়ে আনে না তা ইতিহাস ইতোমধ্যেই প্রমাণ করেছে।
পরিশেষে আমরা এ সকল ইতিহাস বর্ণনার উদ্দেশ্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সূরা ইউসূফের ১১১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবী পরিবারের বিভিন্ন বিরোধ-বিভেদ ইত্যাদির আলোচনা শেষে ইরশাদ করেন–

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب...

(অর্থ:) নিশ্চয়ই তাদের ঘটনাবলীর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে বহু উপদেশ। এসব কোনও মনগড়া কল্পকাহিনী নয় বরং তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ন এবং সবকিছুর বিশদ বিবরণ, আর ঈমানদারদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এসব ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণের তাওফীক দান করুন। আমীন।

তথ্যচিত্র

জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া'র গঠনতন্ত্র

পৃষ্ঠা ০১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳ ৩ ৳ ৩

তিন টাকা

জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া
এর
সংঘ-স্মারক

ছেলে হোক মেয়ে হোক, দুটি সন্তানই যথেষ্ট

"বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম"

সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট, ১৮৬০ মোতাবেক
জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া
এর
সংঘ স্মারক

১। প্রতিষ্ঠানের নাম : জামেয়া রাহ্‌মানিয়া আরাবিয়া

২। ঠিকানা : সাত মসজিদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭।

৩। মূলনীতি, আদর্শ ও উদ্দেশ্য :-

(ক) কোরআনের ও হাদিসের ভিত্তিতে দারুল উলুম দেওবন্দের অনুকরণে একটি বেসরকারী অবৈতনিক/আবাসিক জামেয়া প্রতিষ্ঠা করা, যা দ্বীনের হেফাজত, এমনি দ্বীনের প্রচার ও সুষ্ঠু স্বকীয় বাস্তবায়নে সহায়ক হইবে এবং এমন ছাত্রের বিরাটের অনুপ্রেরণা সমাজ আলেম তৈরী করিবে যাহারা দেশ, জাতি ও ইসলামের জন্য আত্মত্যাগ করিতে সর্বদা নিবেদিত প্রাণ থাকিবে।

(খ) আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদা ও হানাফি ফিকহের অনুসরণ করা।

(গ) মুসলমানদের দান কৃত জাতীয় সম্পদের পবিত্র আমানত রূপে হেফাজত করা এবং উহার সুষ্ঠু [illegible] করা।

(ঘ) মুসলমানদের কতিপয় ইয়াতিম অসহায়দের জীবনকে মহা-আমানত মনে করিয়া তাহাদের জীবন গঠনের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, তাহাদের পাশাপাশি তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা।

(ঙ) শুধু আরবী কিতাবের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক শ্রেণী সমূহে বাংলা, অংক ইত্যাদির মাধ্যমে যুগ উপযোগী সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(চ) ইসলামের প্রচার ও দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত উস্তাদ, হাফেজ, ক্বারী, মুবাল্লিগ ও দ্বীনের খাদেম তৈরী করা এবং তাহাদিগকে ট্রেনিং দিয়া জাতীয় কল্যাণের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা।

(ছ) মুসলিম মিল্লাতের ঈমান, আকায়েদ এবং দ্বীন ও ইসলামের পরিপন্থী নাস্তিকতাবাদী প্রবণতা সমাজে, শিরক, বিদআত ইত্যাদির বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখা, [illegible] ও নারী [illegible] পুরস্কারের মাধ্যমে শিরক, বিদআত ইত্যাদি সমাজ থেকে উৎখাতের জন্য সচেষ্ট থাকা।

৪। এই প্রতিষ্ঠানের সমুদয় আয় প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতি প্রসার ও সংঘ স্মারকে উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলীর সার্বিক বাস্তবায়নের জন্য ব্যয়িত হইবে।

(পরের পাতা/২)

"বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম"

সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট, ১৮৬০ মোতাবেক
জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া
এর
গঠনতন্ত্র

১। সমিতির নাম :- জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া ।

২। সদস্য হওয়ার যোগ্যতা :-

(ক) ছাত্র অভিভাবক :- জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসায় পাঠরত নিয়মিত ছাত্রদের অভিভাবক ।

(খ) শিক্ষক প্রতিনিধি :- জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকদের মনোনীত দুইজন ওস্তাদ সদস্য থাকবেন ।

(গ) চাঁদা দাতা :- পরিচালনা পরিষদ গঠনের অন্ততঃ এক বৎসর পূর্বে যাহারা এককালীন নূন্যতম ৫০০/- (পাঁচ শত) টাকা চাঁদা প্রদান করিয়াছে ।

(ঘ) ভূমি দাতা :- যাহারা মাদ্রাসার জন্য কোন প্রকার স্থাবর সম্পত্তি দান করিয়াছেন ।

(ঙ) বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :- জামেয়া রাহ্‌মানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসার মূল নীতি, আদর্শ উদ্দেশ্য ও সুন্নত ওয়াল জামাত ও হানাফি মাজহাবের পুরাপুরি পাবন্দ ও সমাজী লোকদের মধ্যে হইতে সদস্য গ্রহন করা যাইতে পারে।

৩। সদস্য পদ বাতিলের কারন :-

(ক) যদি কোন সদস্যের মৃত্যু ঘটে ।

(খ) স্বেচ্ছায় কোন সদস্য তাঁর সদস্য পদ হইতে ইস্তফা দিলে ।

(গ) সুন্নত ওয়াল জামাতের ও জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসার স্বার্থের পরিপন্থী কাজে লিপ্ত থাকিলে ।

(ঘ) যদি কোন সদস্য উপর্যুপরি তিনটি সভায় উপস্থিতি থেকে বিরত থাকেন ।

৪। শূন্য সদস্য পদ পূরণ :-

কোন কারনে যদি কোন সদস্য পদ শূন্য হয় তাহা হইলে পরিচালনা পরিষদ শূন্য পদে কো-অপশনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করিতে পারিবেন ।

(পরের পাতা/২)

খ / ২'৫০ — ২০২৫১০৫

:: ২ ::

এবং হিতৈষীদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া আমাদের পক্ষে এবং বিশ্বের সমস্ত মুসলমান নর এবং নারীদের ইহকাল এবং পরকালের নেকী হাসিল করিয়া আমাদের রূহের মাগফিরাত নিমিত্ত তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি নিজ খর্চে খরিদকৃত ভূ সম্পত্তি মোহাম্মদপুরস্থ জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া - সাত মসজিদ মাদ্রাসার বরাবরে আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াকফ করিলাম। অদ্য হইতে উল্লেখিত মাদ্রাসাকে উক্ত সম্পত্তির স্বত্ববান করিয়া আমরা উহা হইতে চিরতরে নিঃস্বত্ববান হইলাম। উক্ত সম্পত্তি নির্দায় ও নিষ্কণ্টক অবস্থায় ওয়াকফ করিয়া দিলাম। এই সম্পত্তি মাদ্রাসা উক্ত সম্পত্তি নির্মাণ ও নিষ্কণ্টক ভাবে পরিচালনা করিবেন। মাদ্রাসা কমিটি আমাদের নামের স্থলে মাদ্রাসার নামে নাম জারী করিয়া খাজনাদি পরিশোধ করিবেন এবং উহা মাদ্রাসার কাজে ব্যবহার ভোগ দখল ব্যবস্থা করিবেন। আমাদের বা আমাদের ওয়ারিশগণের ওজর আপত্তি চলিবে না। করিলেও তাহা সর্ব আদালতে অগ্রাহ্য হইবে।

আমাদের ইচ্ছা মাদ্রাসার কমিটি বৎসরে একবার মাহফিলের বন্দোবস্ত করিবেন ও বিশ্ব মুসলিমদের তরক্কি এবং তাহাদের ইহকাল ও পরকালের সুখ শান্তির জন্য আল্লাহর মুনাজাত করিবেন।

(৩য় পাতায় দেখুন)

তা কুরআন ভুল বলে আখ্যায়িত করেন। অতঃপর হযরত শাইখুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক রাহঃ মজলিসে শুরার সদস্য হিসেবে দীর্ঘদিন শুরার সভাপতি জুমাতে না পাওয়ায় উপর দুঃখ প্রকাশ করে শুরার সভাপতি জুমাতে রেজুলেশন পাশ করেন।

এরপর কাসিমিয়া সম্পর্কে নিয়মিত এবং সার্বিক কল্যাণের জন্য শুরার সভাপতি জনাব সর্ব প্রথম হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ছাহেব এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং সমস্যা নিরসনের সার্বিক বাস্তবতার প্রতি দিক নির্দেশনা ও মূল্যবান পরামর্শ পেশ করার জন্য দাওয়াত পেশ করেন।

হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ছাহেব তার বক্তব্যে ইতিপূর্বে তিনি যে সব চেষ্টা চালিয়েছেন তা উল্লেখপূর্বক দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, জামিয়ার সার্বিক কল্যাণের জন্য আমার পরামর্শ হল, পূর্বের ন্যায় হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেব সহ সকলে মিলে কাজ করা এবং সর্বদা কাসিমিয়ার কল্যাণ কামনা করা। অতএব সকলকে মিলিয়ে কাজ করার কোন পন্থা বের করার উপর তিনি জোর তাগিদ দেন।

অতঃপর সভাতে মজলিস এ পর্যায়ে জামিয়ার বর্তমান প্রিন্সিপাল মাওঃ হিফজুর রহমান ছাহেবকে কাসিমিয়ার মূল সমস্যা ও তার সমাধানের দিক তুলে ধরতে পারে, এবং তা সমাধানের উপর আলোকপাত করার দাওয়াত দেন।

জনাব মাওঃ হিফজুর রহমান ছাহেব তার বক্তব্যে হযরত শাইখুল হাদীস ~~ছাহেব~~ মাওঃ আজীজুল হক ছাহেব ইসলামী ঐক্যজোট নিয়ে বিরোধী জোটের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার থেকে এ পর্যন্ত স্যার শাইখুল হাদীস ছাহেব কর্তৃক গৃহীত ও সর্বসম্মত কানুন বিরোধী যে সব কাজ হয়েছে এবং সে সব কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেবকে জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওঃ নূরুদ্দীন গওহরপুরী সহ জামিয়া সিনিয়র আসাতেযায়ে কেরাম ও পরিচালনা কমিটি এবং বিভিন্ন মুরুব্বীদের মাধ্যমে বারবার দরখাস্ত ও অনুরোধ করা হয়েছে কিন্তু সকল চেষ্টা তদবীর নিষ্ফল হয়েছে, এ মর্মে তিনি বিস্তারিত বর্ণনা দেন। এবং হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেব এর সাথে জামিয়া কর্তৃপক্ষের মূল দ্বন্দ্ব- হযরত শাইখুল হাদীস ছাহেব কর্তৃক গৃহীত [illegible] রাজনীতি নিষিদ্ধ

হযরত সদরে মজলিস উহাতে তাঁর বক্তব্য ব্যক্ত করেন এবং সকলের উপস্থিতিতে বলেন সকলে মুনাসিব মনে করলে উভয়কে আমার মজলিসের ফয়সালা মানতে পারেন। অতঃপর তিনি সাহাবা (রাঃ) এর যুগে জংগে সিফফীন ও এর পরে তাদের উভয় পক্ষের মাঝে সমঝোতার জন্য যে তাহকীম হয়েছিল তার ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত ঘটনা বর্ণনা করেন এবং বর্তমান কাসিমিয়ার উভয় পক্ষের মতানৈক্যকে হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) দের মতানৈক্যের সাথে তুলনা করে এ মতানৈক্য দূর করার মহা পবিত্র কাজে অংশ নেয়ার উপরে গুরুত্বআরোপ করে এবং উক্ত সংকটের মূল কারণ হিসাবে সকলের বক্তব্য-সার সংক্ষেপের উপর বিবেচনা করেন এবং কাসিমিয়াকে তার পূর্বের অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং উভয়ের মাঝে সমঝোতার গুরুত্বের উপর আলোচনা রাখেন এবং সকলকে উলামা দেওবান্দের নীতি-আদর্শের উপর চলার জন্য আহ্বান জানান।

অতঃপর কাসিমিয়ার বর্তমান সংকট দূরীকরণের লক্ষ্যে "তাহকীমের" মত কিছু সময় নিয়ে উভয়ের মাঝে সমঝোতা করার জন্য নিম্নের সিদ্ধান্তাবলী গ্রহণ করেন।

(ক) উভয় পক্ষ বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, প্রত্যেক পক্ষ সে অবস্থার উপর থাকবে, কেউ কারো বিরুদ্ধে নতুন করে কোন পদক্ষেপ নিবে না এবং কোন প্রকার কাদা-ছোড়াছুড়ি করবে না।

(খ) কাসিমিয়ার সংকট নিরসন কল্পে কাসিমিয়ার মজলিসে শূরা থেকে বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামদের নিয়ে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব কমিটি গঠন করা হবে। যার সদস্য হবেন

১। হযরত মাওঃ নূরুদ্দীন গওহরপুরী দাঃবাঃ
২। হযরত মাওলানা [illegible] দাঃবাঃ
৩। হযরত মাওঃ নূর হুসাইন কাসেমী দাঃবাঃ
৪। হযরত মাওঃ মাহমুদুল হাসান দাঃবাঃ
৫। হযরত মাওঃ মুফতী আব্দুর রহমান দাঃবাঃ

উক্ত সাব কমিটি উভয় পক্ষের সাথে আলোচনা চালিয়ে

মজলিসে শূরা অধিবেশন-২

বাস্তব এবং সমস্যা চিহ্নিত করে উহার সমাধানের
রাস্তা বের করতে চেষ্টা করেন।
সদরে মজলিস জনাব প্রস্তাব রাখেন যে, উক্ত
সাব কমিটির আহ্বায়ক মাওঃ নূর হুসাইন কাসেমী থাকবেন

(গ) এ উপলক্ষে আগামী আগষ্ট মাসের ৩০ তারিখে
জামিয়া রাহমানিয়া ভবনে উক্ত সাব কমিটির মিটিং
নির্ধারিত হওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(ঘ) উক্ত সাব কমিটি উক্ত ব্যক্তির সাথে আলোচনার পর
সিদ্ধান্তের আলোকে চূড়ান্ত মজলিসে শূরার
পুনরায় বৈঠক আহ্বান করা হবে এবং সেই সিদ্ধান্তকে
লিখিত দলীল আকারে মজলিসে শূরা কর্তৃক চূড়ান্ত করা হবে।

জনাব সদরে মজলিসের উত্থাপিত প্রস্তাব
সকলে সর্বান্তকরণে সমর্থন করেন এবং উহাকেই
আগামী মজলিসের এজেন্ডা হিসাবে গ্রহণ করে নেন
তবে উপস্থিত সদস্যগণ সাব কমিটির আহ্বায়ক
হিসাবে হযরত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব দাঃবাঃ এর
নাম প্রস্তাব করেন এবং জনাব নূর হুসাইন কাসেমী
সাহেবকে সহযোগী থাকার প্রস্তাব পেশ করেন।
অতঃপর সেটাই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আর কোন প্রস্তাব না থাকায় সদরে মজলিস জনাব
সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অতঃপর দুআ
ও মুনাজাতের মাধ্যমে মজলিস শেষ হয়।

অনুমোদিত হইল।

১৩/৮/2000 ইং

সমিতি এই মর্মে যে সব কাগজাদি পূর্বের নামে ছাপান হইয়াছে, সে গুলোতে নূতন নামের সীল লাগাইয়া ব্যবহার করা হইবে।

(৩) সমিতির নূতন নাম অনুমোদিত হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই পূর্ববর্তী কমিটি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় নূতন ভাবে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সেমতে প্রস্তাব গৃহীত হইল—

(ক) জনাব হাজী আঃ মালেক চৌধুরী - সভাপতি
(খ) জনাব হাজী আঃ মতিন চৌধুরী - সহ সভাপতি
(গ) জনাব মাওলানা ইসহাক চৌধুরী - সহ সভাপতি
(ঘ) জনাব হাফেজ মোজাম্মেল হক চৌঃ - সাধারণ সম্পাদক
(ঙ) জনাব হাজী আহমদ ফজলুর রহমান চৌঃ - কোষাধ্যক্ষ
(চ) জনাব মাওঃ আঃ সাত্তার চৌধুরী - [illegible]

পরিচালনার সুবিধার্থে অন্যান্য সদস্য পরিদর্শনের জন্য নিম্ন লিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি সাব কমিটি গঠন করা হইল।

(ক) জনাব মাওঃ আজিজুল হক চৌধুরী - আহ্বায়ক
(খ) জনাব মাওঃ আঃ সাত্তার চৌধুরী
(গ) জনাব হাজী আঃ মালেক চৌধুরী
(ঘ) জনাব হাফেজ মোজাম্মেল হক চৌধুরী
(ঙ) জনাব হাজী আহমদ ফজলুর রহমান চৌধুরী
(চ) জনাব মাওঃ মোহাম্মদুল্লাহ চৌধুরী
(ছ) জনাব অধ্যাপক হামীদুর রহমান চৌধুরী

(৪) কোম্পানীর ভবিষ্যৎ প্রজেক্ট ২টি পৃথক সাব কমিটি গঠন করা হইল।

(ক) জনাব নূর হোসেন চৌধুরী - সভাপতি
(খ) জনাব মাওঃ আঃ মালেক চৌধুরী - সহ সভাপতি
(গ) ও কোম্পানীর অন্যান্য সব - সদস্য

আরো প্রস্তাব গৃহীত হইল যে জনাব আব্দুল হালীম চৌধুরী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দাওয়াতনামা কোম্পানী উপলক্ষে ছাপান হইবে।

সভাপতির স্বাক্ষর
তাং-

মুমিনপুরী হুযূরের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনে মামলার নথি

০১

☎ { 8113690
8118873

الجامعة الرحمانية العربية محمد فور ڈاکا بنغلادیش

JAMIA RAHMANIA ARABIA
Satmasjid Madrasa, Muhammadpur
Dhaka-1207, Bangladesh

রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাতমসজিদ মাদ্রাসা, মুহাম্মদপুর
ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ।

তারিখ ৮/১১/০১ ইং [illegible]

পাতা-১

বরাবর,
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
মোহাম্মদপুর থানা, ডি, এম, পি,
ঢাকা
বিষয়ঃ এজাহার
জনাব,

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব, পিতা- জনাব মহিবুল হক, সাং- বানু পাড়া, পোঃ পোড়াদহ, থানা- মিরপুর, জেলা- কুষ্টিয়া (বর্তমান ঠিকানাঃ জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া সাতমসজিদ মাদ্রাসা, থানা- মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭) অদ্য ০৮/১১/২০০১ ইং তাং আপনার থানায় স্বশরীরে হাজির হইয়া এই মর্মে লিখিত এজাহার দায়ের করিতেছি যে, গতকাল জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাতমসজিদ মাদ্রাসা, থানা- মোহাম্মদপুর, ঢাকা এর নিরীহ ছাত্র শিক্ষক-কর্মচারীদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও মারধর করিয়া মাদ্রাসা ও মাদ্রাসার সম্পত্তি দখল করিবার অসৎ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত আসামীগন যথাক্রমেঃ আসামী ১। মাওলানা হিফজুর রহমান, পিতা- মৃতঃ মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ, স্থায়ী ঠিকানা- সাং- মোমিনপুর, থানা ও জেলা- চাঁদপুর, (বর্তমানে ৫৭/বি, আলী এ্যান্ড নূর রিয়েল এষ্টেট, বাশবাড়ী, থানা মোহাম্মদপুর ঢাকা) আসামী ২। মুফতী মনসুরুল হক, পিতা- মৃত আব্দুর রহীম গাজী, স্থায়ী ঠিকানা- সাং- গজালিয়া, থানা- পাইকগাছা, জেলা- খুলনা, (বর্তমানে ৮/১, আলী এন্ড নূর রিয়েল এষ্টেট, বাশবাড়ী, থানা- মোহাম্মদপুর, ঢাকা), ৩। হাজী মোজাফফর হুসাইন, পিতা- অজ্ঞাত, সাং -সি/২১, জাকির হোসেন রোড, থানা- মোহাম্মদপুর, ঢাকা, দের উস্কানী ও প্ররোচনায় ২০/২৫ জন উশৃঙ্খল যুবক যাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৪। মুহাঃ সাইদুর রহমান, পিতা- আঃ আউয়াল, সাং- বরুন, পোঃ কাপাশিয়া, থানা- কাপাশিয়া, জেলা- গাজীপুর, (বর্তমান ঠিকানাঃ বিল্ডিং নং- ৭ (নীচতলা), আলী এন্ড নূর রিয়েল এষ্টেট, থানা- মুহাম্মদপুর, ঢাকা), ৫। মুহাঃ মিজানুর রহমান, পিতা- আঃ রাজ্জাক খান, সাং- গাড়ীবাড়ী, পোঃ নইহাটা বাজার, থানা- সাভার, ঢাকা, (বর্তমান ঠিকানাঃ বিল্ডিং নং- ৭ (নীচতলা), আলী এন্ড নূর রিয়েল এষ্টেট, থানা- মুহাম্মদপুর, ঢাকা), ৬। মুহাঃ হাফীজুর রহমান, পিতা- মুসলিমুদ্দীন, সাং- নালুয়া, পোঃ আড়ুয়াটিহি, থানা- চিতলমারী, জেলা- বাগেরহাট, (বর্তমান ঠিকানাঃ বিল্ডিং নং- ৭ (নীচতলা), আলী এন্ড নূর রিয়েল এষ্টেট, থানা- মুহাম্মদপুর, ঢাকা)। তাহারা উপরোল্লিখিত তিন আসামীর প্রশ্রয়ে এবং তত্ত্বাবধানে মাদ্রাসার সন্নিকটে বিল্ডিং নং- ৭ (নীচতলা), আলী এন্ড নূর রিয়েল এষ্টেট, থানা- মুহাম্মদপুর, ঢাকা, থাকিয়া বিভিন্নরকমের অপতৎপরতা চালাইতেছে। যার মধ্যে গতপরশু ০৬/১১/২০০১ ইং তারিখ অনুমান রাত ৮.০০ টার সময় এর ঘটনা নিম্নরূপ- তাহাঁরা উক্ত মাদ্রাসার গেটে

চলমান পাতা-২

মুমিনপুরী হুযূরের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনে মামলার নথি

০২

☎ { 8113690
8118873

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাত মসজিদ মাদ্রাসা, মুহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

JAMIA RAHMANIA ARABIA
Satmasjid Madrasa, Muhamma...
Dhaka-1207, Bang...

সূত্র :   তারিখ ৮/১১/০২ইং

পাতা-২

উপস্থিত হইয়া ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীদের জীবন নাশের হুমকীসহ বিভিন্ন ধরনের ভীতি প্রদর্শন করিয়া মাদ্রাসা ও মাদ্রাসার সম্পত্তি দখল করার চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করিলে উপস্থিত মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারীদের উপস্থিতি ও সাম্ভাব্য প্রতিরোধের আশঙ্কা করিয়া ও বাধার মুখে আসামীগণ মাদ্রাসার গেটে ৭/৮ টি বোমা ও ককটেল ফাটাইয়া মাদ্রাসা ও মাদ্রাসা সংলগ্ন এলাকার জনগণ ও মাদ্রাসার উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারীদের মনে মারাত্মক ভীতি, আতঙ্ক এবং ত্রাশ সৃষ্টি করিয়া এবং অচিরেই পুনরায় আরো ভয়াবহ হামলা করিয়া তাহারা মাদ্রাসা ও মাদ্রাসার সম্পত্তি দখল করার হুমকী প্রদান করিয়া চলিয়া যায়। বর্তমানে উপরোক্ত আসামীগণ কর্তৃক যে কোন সময়ে সম্ভাব্য ভয়ানক প্রাণঘাতী আক্রমন ও হামলার ভয়ে মাদ্রাসার নিরীহ ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারীগণ অত্যন্ত আশঙ্কিত অবস্থায় রহিয়াছে।

অতএব উপরোক্ত বিষয়ে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বাধিত করিতে হুজুরের মর্জি হয়।

নিবেদক

(মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব)
পিতা- জনাব মহিবুল হক
সাং- বাবু পাড়া, পোঃ পোড়াদহ, থানা- মিরপুর, জেলা- কুষ্টিয়া
(বর্তমান ঠিকানাঃ জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাতমসজিদ মাদ্রাসা, থানা- মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭)

মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব এবং মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হামলা সংক্রান্ত মামলার নথি

পরিচালনা কমিটির সদস্যদের জেলে ঢোকানোর প্রচেষ্টা সংক্রান্ত মামলার নথি

বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ ৩য় আদালত, ঢাকা।

ভায়োলেশন মিস কেস নং ....৩৭..../২০০৭

(দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ৯৭/২০০৬ হইতে উদ্ভূত)

১। আব্দুল মালেক, পিতা- মৃত হযরত আলী, সাকিন- ৯৮, বসিলা, থানা- মোহাম্মদপুর, হালে-হাজারীবাগ, জেলা- ঢাকা। বর্তমানে-জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, মাদ্রাসার বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

........বিবাদী দরখাস্তকারী।

-ঃ বনাম ঃ-

১। মোহাম্মদ আলী, পিতা-মৃত হাজী আব্দুস সাত্তার, সাং- ৮৫, বসিলা, থানা- মোহাম্মদপুর হালে হাজারীবাগ, ঢাকা।

২। হাজী আহাম্মদ ফজলুর রহমান, পিতা-মরহুম ফকির চান, সাং- বাড়ী নং- ২৭, সড়ক নং-৩৯, গুলশান, ঢাকা।

........বাদী প্রতিপক্ষগণ।

৩। মাওলানা আজিজুল হক, পিতা- এরশাদ আলী, সাং- ৭/২, আজিমপুর রোড, থানা- লালবাগ, ঢাকা।

-----বিবাদী মোকাবেলা প্রতিপক্ষ।

পরিচালনা কমিটির সদস্যদের জেলে ঢোকানোর প্রচেষ্টা সংক্রান্ত মামলার নথি

321547

বেদখল করিতে পারেন। নালিশী সম্পত্তিতে অত্র বাদী প্রতিপক্ষগণের কোনরূপ স্বত্ব স্বার্থ, অধিকার ও দখল কিছুই নাই এবং খালিকানা কোন প্রশ্নই উঠে না। উপরোক্ত পরিস্থিতিতে বাদী প্রতিপক্ষগণ যাহাতে বিবাদী দরখাস্তকারীকে অত্র মামলা শেষ হইবার পূর্বেই অত্র আদালতের স্থিতাবস্থাদেশ অমান্য করিয়া নালিশী মাদ্রসা ভবনে বাদীর শান্তিপূর্ণ পরিচালানায় কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারে তজ্জন্য বাদী প্রতিপক্ষগণকে দেওয়ানী কারাগারে আটক রাখা প্রয়োজন। অন্যথায় অত্র আদালতে বিচারাধীন দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ৯৭/২০০৬ ফলাফলহীন হইয়া যাইবে এবং বিবাদী দরখাস্তকারীগণ অপূরনীয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

অতএব, উপরোক্ত অবস্থাধীন বিজ্ঞ আদালত দয়াপরবশ হইয়া,

ক) বাদী প্রতিপক্ষগণকে দেওয়ানী কারাগারে আটক রাখিয়া শাস্তি বিধান করিতে ;

খ) আইন ও ইকুইটি মতে অত্র দরখাস্তকারী পক্ষ আর যে সকল প্রতিকার পাইতে হকদার হন তাহাও প্রদান করিতে মর্জি হয়।

হাইকোর্টের রায়ে দখলদারদের কমিটিকে অবৈধ ঘোষণা

০৭

The Suit being Title Suit No.97 of 2006 is hereby decreed.

The press release dated 04.11.2001 published in the Daily Inquilab by the defendants and that the Constitution of 9 member Convenying Committee by defendant No.1 on 03.11.2001 for Jameya Rahmania Arabia Madrasha is illegal, inoperative and not binding upon the plaintiffs.

Mir Hashmat Ali.

Pradip.

Read by/-

Exd.by/-

10.05.12

Correct reproduction of the original.

Suman Chandra
Assistant Bench Officer
Supreme Court of Bangladesh
High Court Division Dhaka

প্রত্যায়িত অবিকল প্রতিলিপি

10-5-12

দখলদারদের ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রথমবার উচ্ছেদের তারিখ নির্ধারণ

পৃষ্ঠা ৫২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,ঢাকা
(রাজস্ব শাখা)

স্মারক নং-জেঃপ্রঃঢাঃ/রাঃ-উচ্ছেদ-১৪৭/২০০৭-   তারিখ : /০৭/২০০৮ খ্রীঃ

বিষয় : উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পুলিশ ফোর্স মোতায়েন প্রসংগে।

সূত্র : স্মারক নং-জেঃপ্রঃঢাঃ/রাঃ-উচ্ছেদ-১৪৭/২০০৭-২০১৬(৯) তাং-২৯/০৬/২০০৮।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সহকারী প্রশাসক, ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা ২৩/০৭/২০০৭ তারিখের ওঃপ্রঃ/ঢাঃউঃ/০১৯০ নং স্মারকপত্রের প্রেক্ষিতে জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ মাদ্রাসা ওয়াকফ এস্টেটের ০৪(চার)টি কক্ষের অবৈধ দখলদারগণকে উচ্ছেদের নিমিত্ত নিম্নস্বাক্ষরকারীকে নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আগামী ১০/০৭/২০০৮ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা সময় ধার্য করা হলো।

এমতাবস্থায়, নির্ধারিত তারিখ ও যথাসময়ে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনায় আইন-শৃংখলা রক্ষার্থে পুলিশ অফিসারসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক (পুরুষ ও মহিলা) পুলিশ ফোর্স ঘটনাস্থলে মোতায়েন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/
(মোহাম্মদ কামরুজ্জামান)
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
ঢাকা কালেক্টরেট, ঢাকা।

পুলিশ কমিশনার
ডি.এম.পি, ঢাকা।

স্মারক নং-জেঃপ্রঃঢাঃ/রাঃ-উচ্ছেদ-১৪৭/২০০৭-২০৫৩/১ (৮)   তারিখ : ০৯/০৭/২০০৮ খ্রীঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। উপ-পুলিশ কমিশনার (তেজগাঁও বিভাগ), ডিএমপি, ঢাকা।
২। সহকারী প্রশাসক, ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা। প্রতিনিধি প্রেরণপূর্বক উচ্ছেদের নির্ধারিত তারিখে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৩। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা।
৪। নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, ঢাকা কালেক্টরেট, ঢাকা। আগামী ১০/০৭/২০০৮ তারিখে যাতায়াতের জন্য যানবাহন সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৫। সহকারী কমিশনার(গোপনীয়), ইহা জেলা প্রশাসক, ঢাকা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৬। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মোহাম্মদপুর থানা, ডিএমপি, ঢাকা। আইন-শৃংখলা রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
৭। আলহাজ্ব আহমদ ফজলুর রহমান, মোতওয়াল্লী/সভাপতি, জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ মাদ্রাসা ওয়াকফ এস্টেট পরিচালনা কমিটি, বাড়ী নং-২৭, রোড নং-৩৯, গুলশান, ঢাকা।
৮। অফিস কপি।

[illegible] ০৯.০৭
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
ঢাকা কালেক্টরেট, ঢাকা।

সুপ্রিম কোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চে দখলদারদের উচ্ছেদের নির্দেশ বহাল

০৯

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
APPELLATE DIVISION

CIVIL MISC. PETITION NO. 684 OF 2009.

Mawlana Azizul Haque .... Petitioner.

-Versus-

Administration of Waqfs, Bangladesh waqfs Bhaban, Dhaka and others ...Respondents.

PRAYER : For stay operation of the judgment and order dated 20-8-09 passed by the High Court Division in Writ Petition No. 6038 of 2009.

-And-

Stay operation of the order of enrolment issued in E.C No. 19588 arising out of Misc. E.C.No. 03 of 2002 passed by the respondent No.1 Administrator of Waqfs and communicated under the Signature of the respondent No. 2 vide Memo No. [handwritten, illegible] and impugned letter being Memo No. [handwritten, illegible]

ORDER

No order

Sd/-S.K. Sinha J.
15-9-2009.

C.M.P 654/09
16.9.09

সুপ্রিম কোর্টের ফুল বেঞ্চের চূড়ান্ত রায়ে দখলদারদের উচ্ছেদের নির্দেশ বহাল

১০

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
APPELLATE DIVISION

Present:
Mr. Justice Mohammad Fazlul Karim, Chief Justice
Mr. Justice Md. Abdul Matin,
Mr. Justice A.B.M Khairul Haque,
Mr. Justice Md. Muzammel Hossain.

CIVIL PETITION FOR LEAVE TO APPEAL NO.166 OF 2010.
(From the judgment and order dated 19.08.2009 and 20.08.2009 passed by the High Court Division in Writ Petition No. 6038 of 2008)

Mawlana Azizul Haque ... Petitioner

-Versus-

Administrator of Waqfs and others ... Respondents

For the Petitioner	:	Mr. Md. Aftab Hossain, Advocate-on-Record.
For Respondent No. 9	:	Mr. Md. Nawab Ali, Advocate-on-Record.
Respondent Nos. 1-8	:	Not rpresented.
Date of hearing	:	The 9th March, 2010.

ORDER

Mr. Md. Aftab Hossain, learned Advocate-on-Record for the petitioner, prayed for an order of adjournment of the case. We upon rejecting the said prayer for adjournment called upon the learned Advocate-on-Record to make submission in support of the leave petition but he declined to make any submission.

Accordingly, the leave petition is dismissed for default.

Sd/- M. Fazlul Karim C.J.
Sd/- M. A. Matin J.
Sd/- A. B. M. Khairul Haque J.
Sd/- M. M. Hossain J.

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY
Assistant Registrar 13.3.10
Appellate Division
Supreme Court of Bangladesh

The 9th March, 2010.
M.Rahman
16.3.10

সুপ্রিম কোর্টের ফুল বেঞ্চের চূড়ান্ত রায়ে দখলদারদের উচ্ছেদের নির্দেশ বহাল

১০

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
APPELLATE DIVISION

Present
Mr. Justice Mohammad Fazlul Karim, Chief Justice
Mr. Justice Md. Abdul Matin,
Mr. Justice Shah Abu Nayeem Mominur Rahman,
Mr. Justice A.B.M Khairul Haque
Mr. Justice Md. Muzammel Hossain
Mr. Justice S.K. Sinha

CIVIL PETITION FOR LEAVE TO APPEAL NO.166 OF 2010
(From the judgment and order dated 19.08.2009 and 20.08.2009 passed by the High Court Division in Writ Petition No 6038 of 2008)

Mawlana Azizul Haque ... Petitioner

-Versus-

Administrator of Waqfs and others ... Respondents

For the Petitioner : Mr. Munsurul Haque Chowdhury, Senior Advocate instructed by Mr. Md. Aftab Hossain, Advocate-on-Record

For Respondent No.9 : Mr. Golam Arshad, Advocate instructed by Mr. Md. Nawab Ali Advocate-on-Record

Respondent Nos. 1-8 : Not represented.

Date of hearing : The 18th July, 2010.

ORDER

This petition for leave to appeal is directed against the judgment and order dated 19.08.2009 and 20.08.2009 passed by the High Court Division in Writ Petition No. 6038 of 2008.

The learned Counsel for the petitioner submits that since the Civil Court has decided the issues in the matter, the petitioner has no cause for concern in this petition.

Accordingly, the leave petition is dismissed.

Sd/- M. Fazlul Karim, CJ
Sd/- Md. A. Matin, J
Sd/- Shah A. N. M. Rahman, J
Sd/- A. B. M. Khairul Haque, J
Sd/- Md. M. Hossain, J
Sd/- S. K. Sinha, J

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY

Assistant Registrar 04.8.10
Appellate Division
Supreme Court of Bangladesh

The 18th July, 2010
M. Rahman

দখলদারদের ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দ্বিতীয়বার উচ্ছেদের তারিখ নির্ধারণ

১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,ঢাকা
(রাজস্ব শাখা)

স্মারক নং-জেঃপ্রঃঢাঃ/রাঃ-উচ্ছেদ-১৪৭/২০০৭-

তারিখ : বৈশাখ ১৪১৬ / এপ্রিল ২০০৯

বিষয় : উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পুলিশ ফোর্স মোতায়েন প্রসঙ্গে।

সূত্র : স্মারক নং-জেঃপ্রঃঢাঃ/রাঃ-উচ্ছেদ-১৪৭/২০০৭-৮২(৯) তাং-১৫/০১/২০০৯খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সহকারী প্রশাসক, ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা ২৩/০৭/২০০৭খ্রিঃ তারিখের ওঃপ্রঃ/ঢাঃউঃ/০১৯০ নং স্মারকপত্রের প্রেক্ষিতে জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ মাদ্রাসা ওয়াকফ এস্টেটে অবস্থানরত অবৈধ দখলদারগণকে উচ্ছেদের নিমিত্ত নিম্নস্বাক্ষরকারীকে নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আগামী ২৮/০৪/২০০৯খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা সময় ধার্য করা হলো।

এমতাবস্থায়, নির্ধারিত তারিখ ও যথাসময়ে উপরোক্ত কার্যক্রম পরিচালনায় আইন-শৃংখলা রক্ষার্থে পুলিশ অফিসারসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক (পুরুষ ও মহিলা) পুলিশ ফোর্স ঘটনাস্থলে মোতায়েন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/-
মুহাম্মদ মকবুল হোসেন
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
ঢাকা কালেক্টরেট, ঢাকা।

পুলিশ কমিশনার
ডি,এম,পি, ঢাকা।

স্মারক নং-জেঃপ্রঃঢাঃ/রাঃ-উচ্ছেদ-৯০/২০০৮-৭২৫/১(৮)

তারিখ : ০৬ বৈশাখ ১৪১৬ / ১৯ এপ্রিল ২০০৯

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। উপ-পুলিশ কমিশনার (তেজগাঁও বিভাগ), ডিএমপি, ঢাকা।
২। সহকারী প্রশাসক, ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা।
৪। নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, ঢাকা কালেক্টরেট, ঢাকা। আগামী ২৮/০৪/২০০৯খ্রিঃ তারিখ যাতায়াতের জন্য যানবাহন সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হলো।
৫। সহকারী কমিশনার(গোপনীয়), ইহা জেলা প্রশাসক, ঢাকা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৬। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মোহাম্মদপুর থানা, ডিএমপি, ঢাকা।
৭। আলহাজ্ব আহমদ ফজলুর রহমান, মোতওয়াল্লী/ সভাপতি, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ মাদ্রাসা ওয়াকফ এস্টেট পরিচালনা কমিটি, বাড়ী নং-২৭, রোড নং-৩৯, গুলশান, ঢাকা।
৮। অফিস কপি।

১৯।৪।০৯

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
ঢাকা কালেক্টরেট, ঢাকা।

আদালত কর্তৃক বাদীর পক্ষে স্থগিত আদেশ-এর চিত্র
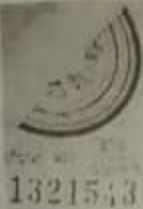
1321543

৩। উপরোক্তাদিগকে নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তখানি বিগত ০১/১২/২০০১ ইং তারিখে একতরফাভাবে শুনানী হইলে বিজ্ঞ আদালত [illegible] বিবাদীগণের বিরুদ্ধে কারণদর্শানো নোটিশ সহ এক অর্ন্তবর্তীকালীন যাহাতে [illegible] জোর পূর্বক, বে-[illegible] উচ্ছেদ/বেদখল করিতে না পারে কিংবা নালিশী সম্পত্তিতে [illegible] করিতে না পারে বাদীগণের শান্তিপূর্ণ ভোগ দখলে কোনরূপ বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারে [illegible] প্রার্থনা করেন [illegible] বিবাদীগণের বিরুদ্ধে [illegible] নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করেন [illegible] সেইমতে বাদী দরখাস্তকারীগণ দেওয়ানী কার্যবিধির [illegible] আদেশের ১ ও ২ নিয়ম এবং তৎসহ ১৫১ ধারা অনুযায়ী এক দরখাস্ত দাখিলক্রমে [illegible] মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিবাদী প্রতিপক্ষগণ এই বাদী [illegible] বাদীগণকে যাহাতে নালিশী সম্পত্তি হইতে জোর পূর্বক বে-আইনীভাবে বে-দখল করিতে না পারে এবং নালিশী সম্পত্তিতে জোর পূর্বক [illegible] অনুপ্রবেশ না করিতে পারে এবং বাদী দরখাস্তকারীগণ যাহাতে তাহাদের মালিকানা ও দখলাধীন নালিশী সম্পত্তিতে শান্তিপূর্ণ ভোগদখলে বাধা সৃষ্টি করিতে না পারে তজ্জন্য বিবাদী প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে এক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেন। সেইমতে উক্ত দরখাস্ত নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত বিবাদী প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে এক অর্ন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার [illegible] আদেশ প্রার্থনা করেন। উক্ত দরখাস্ত [illegible] আদেশ প্রদান করেন।

"অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী পক্ষের দাখিলী দেওয়ানী কার্যবিধির ৩৯ অর্ডার ১/২ রুল ও ১৫১ ধারার বিধান মতে আনীত দরখাস্তটি ১ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে বিনা খরচে পরিবর্তিত আকারে মঞ্জুর করা হইল। এতদ্বারা মূল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাদী প্রতিষ্ঠান ও উহার সহিত সম্পর্কিত সকল কর্মকান্ড বর্তমানে যেভাবে পরিচালিত হইতেছে সেইভাবে পরিচালিত হওয়া নিমিত্তে বাদী বিবাদী উভয়পক্ষের উপর স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ প্রদান করা হইল। এতদ্বারা মোকদ্দমার বিগত ১/১২/০১ ইং তারিখে প্রদত্ত অর্ন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশ ভ্যাকেট করা হইল।"

৩। উপরোক্ত স্থিতাবস্থাদেশ বলবৎ থাকাবস্থায় উক্ত ৯৭/০৬ মোকদ্দমার বাদীগণ পক্ষে আলহাজ্ব আব্দুল মালেক, পিতা মৃত মুহাম্মদ হাসেম, ২৫, তেজগাঁও স্টেশন রোড, তেজগাঁও, ঢাকা বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসকের

২০২১ খ্রিস্টাব্দে ওয়াকফ প্রশাসন কর্তৃক বৈধ কমিটিকে তালিকাভুক্তি

বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়
Office of the Administrator of Waqfs, Bangladesh
৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা- ১০০০ । 4, New Eskaton Road,Dhaka-1000
ফোন : ৯৩৩৪৯২৩, ফ্যাক্স # ৯৩৩৭১৭৫ ই-মেইল # info@waqf.gov.bd. Website : www.waqf.gov.bd.

স্মারক নং : ১৬.০২.০০০০.০১৬.৩১.০৪৪.১৬/১৬৮

তারিখ : ১৮/০৫/২০২১ খ্রিঃ

বিষয় : কমিটি অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র :
১। ই, সি, নং-১৯৫৮৮(২য় খন্ড),জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ মাদ্রাসা ওয়াকফ এস্টেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
২। আলহাজ্ব আব্দুর রহীম কর্তৃক দাখিলকৃত গত ১০/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখের আবেদন।
৩। ওয়াকফ পরিদর্শক কর্তৃক দাখিলকৃত গত ২৮/০৪/২০২১ খ্রিঃ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন।
৪। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৭৭৪৯/২০১০ এর গত ০৪/০৫/২০২১ তারিখের আদেশ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ২ নং সূত্রোক্ত আবেদন ও মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৭৭৪৯/২০১০ এর গত ০৪/০৫/২০২১ তারিখের আদেশ বিবেচনায় ও ৩ নং সূত্রোক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ মাদ্রাসা ওয়াকফ এস্টেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার স্বার্থে নিম্ন বর্ণিত ২১(একুশ) সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি ১৮/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখ হতে পরবর্তী ৩(তিন) বছরের জন্য আদেশক্রমে অনুমোদন দেয়া হলো।

পরিচালনা কমিটির তালিকা

ক্রম	সদস্যদের নাম	পেশা	ঠিকানা	পদবী
১	জনাব আলহাজ্ব আব্দুর রহীম	ব্যবসা	১২০ গ্রীন রোড, ফার্মগেট, ঢাকা	সভাপতি
২	জনাব আলহাজ্ব হারুনুর রশীদ	ব্যবসা	৬১/১ পূর্ব রাজের বাজার, আল মদিনা লেন, ধানমন্ডি, ঢাকা	সহ-সভাপতি
৩	জনাব আলহাজ্ব আমীনুজ্জামান	ব্যবসা	৩নং সেগুন বাগিচা, সজন টাওয়ার, ২ বায়োফ্রিড ইন্টার ন্যাশনাল, ঢাকা	সহ-সভাপতি
৪	জনাব আলহাজ্ব কাজী সাহিদুর রহমান	ব্যবসা	রোড-৬/১, বাড়ী-৪৭, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫	সম্পাদক
৫	জনাব আলহাজ্ব হাফিজ আব্দুল গাফফার	ব্যবসা	৩৫, লালবাগ রোড, লালবাগ, ঢাকা।	অর্থ সম্পাদক
৬	জনাব আলহাজ্ব মাওলানা হিফজুর রহমান	শিক্ষকতা	ঘাটারচর, উলামানগর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	রঈস
৭	জনাব আলহাজ মুফতী মনসুরুল হক	শিক্ষকতা	২৪১/১/বি, বসিলা রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।	শাইখ
৮	জনাব আলহাজ ক্বারী মুজাফফর হুসাইন	ব্যবসা	বি/২১, জাকির হোসেন রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা	সদস্য
৯	জনাব আলহাজ ডা. আব্দুল কাইউম	ব্যবসা	২২, তেজগাঁও রেল স্টেশন রোড,ঢাকা	সদস্য
১০	জনাব আলহাজ কাজী মুজাম্মেল হুসাইন	ব্যবসা	বাড়ী-২২৭ রোড-৭, মুহাম্মাদী হা.লি. মুহাম্মদপুর, ঢাকা	সদস্য
১১	জনাব আলহাজ আকরাম হুসাইন	ব্যবসা	বাসা-১৪, রোড-২৩, ব্লক বি,বনানী, ঢাকা	সদস্য
১২	জনাব আলহাজ উমর ফারুক মির্জা	ব্যবসা	৬/বি, রুবি রোড, এপার্টমেন্ট ৩/১, আসাদ এভিনিউ, মুহা.পুর, ঢাকা	সদস্য
১৩	জনাব আলহাজ মুনীর সাঈদ	ব্যবসা	বাড়ী-১৬৩, রোড-৩, মুহাম্মদী হা.লি. মুহা.পুর, ঢাকা	সদস্য
১৪	জনাব আলহাজ আলী হুসাইন	ব্যবসা	৫/বি, সলিমুল্লাহ রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা	সদস্য
১৫	জনাব আলহাজ ডা. আহসানুল্লাহ	ব্যবসা	ফ্লাট-বি-৭, ১১০, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা	সদস্য
১৬	জনাব আলহাজ ডা. ইখলাসুর রহমান	ব্যবসা	ইয়ামাগাথা হাসপাতাল, মেরাদিয়া বাজার, বনশ্রী, ঢাকা	সদস্য
১৭	জনাব আলহাজ আব্দুল হালীম	ব্যবসা	বাড়ী-৫, রোড-১, স্বপ্নধারা হাউজিং, মুহাম্মদপুর, ঢাকা	সদস্য
১৮	জনাব আলহাজ আব্দুর রব	ব্যবসা	ফ্লাট-৬০৩ বিল্ডিং-১৫, জাপান গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা	সদস্য
১৯	জনাব আলহাজ হিফজুল বারী	ব্যবসা	হাউজ-৩৯, রোড-৪/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা	সদস্য

২০২১ খ্রিস্টাব্দে ওয়াকফ প্রশাসন কর্তৃক বৈধ কমিটিকে তালিকাভুক্তি

-২-

২০	জনাব আলহাজ আব্দুল মতীন	ব্যবসা	বাড়ী-৯, রোড-৮/বি, মুহাম্মদী হা: সোসাইটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা	সদস্য
২১	জনাব আলহাজ মাহদী হাসান	ব্যবসা	আলী এন্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মদপুর, ঢাকা	সদস্য

মো: [illegible] কাওছার
(উপ সচিব)
সহকারী প্রশাসক (ঢাকা জেলা)
বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসন।

জনাব আলহাজ্ব আব্দুর রহীম
সভাপতি
জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ মাদ্রাসা ওয়াকফ এস্টেট পরিচালনা কমিটি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

তারিখ : ১৮/০৫/২০২১ খ্রি:

স্মারক নং : ১৬.০২.০০০০.০১৬.৩১.০৪৪.১৬/১৬৮-১৬৮(৪)

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে :-

১। সভাপতি, জেলা ওয়াকফ উন্নয়ন কমিটি ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
২। ওয়াকফ পরিদর্শক, ঢাকা অঞ্চল-৪।
৩। ওয়াকফ প্রশাসক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী (প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৪। অফিস কপি।

মো: [illegible] কাওছার
(উপ সচিব)
সহকারী প্রশাসক (ঢাকা জেলা)
বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসন।

ওয়াকফ প্রশাসন কর্তৃক অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ এবং বৈধ কমিটিকে বুঝিয়ে দেয়ার নির্দেশ

১৪

বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়
Office of the Administrator of Waqfs, Bangladesh
৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৪৯৩৫৭৬৮২, ফ্যাক্স # ৪৯৩৫৭১৭৫ ই-মেইল # waqf.gov.bd.@ gmail.com.

তারিখ : ২১/০৬/২০২১ খ্রিঃ।

স্মারক নং : ১৬.০২.০০০০.০১৬.০১.০৪৪.১৬/ ২১২

বিষয় : জামি'আ রাহ্মানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ মাদ্রাসা ওয়াকফ এস্টেট এর দখল বুঝিয়ে দেয়া প্রসঙ্গে।

সূত্র : ১। ই. সি. নং-১৯৫৮৮ (২য় খন্ড) জামি'আ রাহ্মানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ মাদ্রাসা ওয়াকফ এস্টেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা অঞ্চল-৪।
২। জামি'আ রাহ্মানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুর রহীম কর্তৃক দাখিলকৃত ২৪/০৬/২০২১ তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রদ্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ২ নং সূত্রোক্ত আবেদনের ছায়ালিপি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। এ আবেদনের পূর্বে এ কার্যালয়ের গত ১৮/০৫/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বর্ণিত ওয়াকফ এস্টেট পরিচালনার জন্য নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। ২ নং সূত্রোক্ত আবেদন অনুযায়ী জামি'আ রাহ্মানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ মাদ্রাসা ওয়াকফ এস্টেটের নবগঠিত পরিচালনা কমিটির সভাপতি বরাবরে মাদ্রাসার দখল বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ- ৩(তিন) পাতা।

২১/৬/২১
আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি
(অতিরিক্ত সচিব)
ওয়াকফ প্রশাসক,বাংলাদেশ।
ফোন-৪৯৩৫৭৬৮২।

জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা ওয়াকফ উন্নয়ন কমিটি
জেলা-ঢাকা।

স্মারক নং : ১৬.০২.০০০০.০১৬.০১.০৪৪.১৬/ তারিখ : /০৬/২০২১ খ্রিঃ।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ঃ-

১। আলহাজ্ব আব্দুর রহীম, সভাপতি, জামি'আ রাহ্মানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

Received
২১

উপ-প্রশাসক(২)
বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসন
ঢাকা।

দখলদারদের কমিটিকে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ১ বছরের অনুমোদন দানকালে ব্যবহৃত ভাষা

১৭

তারিখ ২৫/০৮/২০১০

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ থেকে চূড়ান্তভাবে দখলদারদের কমিটিকে অবৈধ ঘোষণা এবং এ বিষয়ে দখলদারদের মামলার কার্যক্রম অগ্রসর করার কোন বৈধতা নেই মর্মে সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং দখলদারদেরকে থার্ডপার্টি হিসেবে সম্বোধন

[illegible] has been filed by as many as 16 persons to be added as [illegible] in the petition stating that they are the elected body of the [illegible] Committee of Jameya Rahmania Arabia Madrasha and they have been functioning "for the period of 2014-2016", so they are the necessary persons [illegible] represent "the civil petition for leave to appeal."

On behalf of respondent Nos.1 and 2, an application has been filed [illegible] an order of abatement of the petition on the ground that after the death of the sole petitioner on 08.08.2012 at his residence, his successors have not been substituted within the statutory time.

We have considered both the petitions. Since the suit was filed challenging the formation of a 9(nine) member convening committee of Jameya Rahmania Arabia Madrasha for its management with defendant No.1 as its convenor who also died in the meantime, which was notified in the daily Inqilab on 04.11.2001 and was admittedly for a period of 6(six) months, factually and legally this petition has become infructuous due to the death of the sole petitioner, Maulana Azizul Huq. Therefore, the application for addition of party filed by the 3rd parties does not deserve any consideration on merit and accordingly, the same is rejected.

We are of the further view that with the death of the sole petitioner, Maulana Azizul Huq, there is no subsisting cause of action to proceed with the petition either by his heirs or by any other person in view of the nature of the suit.

Accordingly, the petition is dismissed.

Sd/- M. A. Wahhab Miah, J.
Sd/- M. Imman Ali, J.

[illegible] TO BE TRUE COPY
Superintendent
Appellate Division
Supreme Court of Bangladesh

২০০১ খ্রিস্টাব্দের পর দখলদারদের অঙ্গীকারনামায় ঈষৎ পরিবর্তিত ৮নং ধারা

ভর্তিচ্ছু ছাত্রের অঙ্গীকার

আমি.. অত্র জামিয়ায় ভর্তি হইতে ইচ্ছুক।

আমি মনে প্রাণে অঙ্গীকার করিতেছি যে,

১। জামিয়ার বর্তমান এবং ভবিষ্যতে গৃহীতব্য সকল আইন-কানুন অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব।

২। দরস, মুতালায়া ও তাকরারের যথাযথ পাবন্দি করিব। পড়াশোনা ছাড়া অন্য কোন শোগল রাখিব না। একান্ত অপরাগতা ছাড়া অহেতুক ওযর বানাইয়া ছুটি নিব না এবং সবক কামাই করিব না।

৩। পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, গল্প-উপন্যাসের বই এবং ফাসিদ আক্বিদা ও ফাসিদ চিন্তাধারার লেখকদের কোন বই পড়িব না।

৪। সর্বদা সুন্নত তরিক্বা মোতাবিক আদর্শ জীবন যাপন করিব। সুন্নতি পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার ইখতিয়ার করিব। এই ব্যাপারে আমাদের আকাবির রহ. গনের তরয-তরিক্বাকেই নমুনা হিসাবে গ্রহণ করিব।

৫। পাঞ্জাবি সাদাসিধে, ঢিলাঢালা ও হাটুর কমপক্ষে ৪ আঙ্গুল পরিমাণ নিচ পর্যন্ত, পায়জামা ও লুঙ্গি পায়ের টাখনুর উপর পর্যন্ত পরিধান করিব এবং সর্বদা পাঁচকলি টুপি ব্যবহার করিব।

৬। সর্বদা নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিব এবং আশ-পাশ পরিচ্ছন্ন রাখিব। মাথার চুল ও হাত পায়ের নখ ছোট এবং মোচ খাট করিয়া রাখিব। দাড়ি কখনও কাটিব না বা উপড়াইব না এবং এক মুষ্টির ভিতরে ছাটিব না।

৭। সংশিষ্ট নেগরান হুজুরের অনুমতি ব্যতীত কখনও মাদরাসার বাহিরে যাইব না। সর্বদা জামিয়ার নির্ধারিত মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায তাকবিরে উলার সহিত আদায় করিতে সচেষ্ট থাকিব।

৮। জামিয়ায় শিক্ষাকালে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন রাজনৈতিক দল বা ছাত্র সংগঠনের সহিত কোনভাবে জড়িত হইব না। জামিয়ার অভ্যন্তরেও কোন দলাদলি করিব না। অন্যথায় বহিষ্কারাদেশসহ যে কোন শাস্তি মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিব।

৯। আমি ওয়াদা করিতেছি যে, জামিয়ায় পড়া অবস্থায় আলিয়া মাদরাসার কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিব না। যদি আমি ইহা অমান্য করি তবে বহিষ্কারের উপযুক্ত সাব্যস্ত হইব।

১০। জামিয়ার উন্নতি ও সুনাম-সুখ্যাতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিব। দ্বীনের প্রয়োজনে বা জামিয়ার কল্যাণে কখনো কোন খিদমতের তাকাযা আসিলে তাহা সানন্দে আঞ্জাম দিতে প্রস্তুত থাকিব।

১১। জামিয়ার উস্তাদগণের যথাযথ ইহতিরাম ও খিদমতকে নিজের জন্য সৌভাগ্যের ওসীলা মনে করিব এবং তাদের আদেশ-উপদেশ মানা করাকে নিজের ফরিজা বলিয়া জানিব। মাদরাসার খাদিম ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করিব।

১২। আসাতিযায়ে কেরামের খায়েরখাহি মূলক যে কোন শাসন-তরবিয়ত মানিতে বাধ্য থাকিব। উহাকে নিজের জীবনের ইসলাহ এবং ইলম ও আমলের উন্নতির সোপান বলিয়া মনে করিব।

১৩। সকল ছাত্রদের সহিত ভাই ভাই সুলভ ভদ্র আচরণ করিব। কাহারো সহিত অবাঞ্ছিত বন্ধুত্বের সম্পর্কও স্থাপন করিব না বা শত্রুতাও পোষণ করিব না। কোন অবস্থাতেই কাহারো সহিত ঝগড়া-ফাসাদ করিব না।

১৪। জামিয়ার আসবাব পত্রের যথাযথ হিফাজত করিব। জামিয়ার কোন সম্পদ নষ্ট হইতে দিব না বা নিজে কোন জিনিসের ক্ষতিসাধন করিব না। জামিয়ার পানি, বাতি, পাখা ইত্যাদির খরচে মিতব্যয়ী হইব এবং অপচয় সম্পর্কে সতর্ক থাকিব।

১৫। জামিয়ার কোন কানুন অমান্য করিলে যথোচিত শাস্তি অথবা বহিষ্কারাদেশ মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিব। ইহাতে আমার বা আমার অভিভাবকের কোন প্রকার আপত্তি থাকিবে না।

____

ছাত্রের স্বাক্ষর

" ইলেম-রত্ন অর্জনে চেষ্টা-সাধনার সবটুকু উজাড় করে দাও। তার জন্য নিজের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ প্রয়োজনে সবটুকু বিসর্জন দাও। মান-অভিমান, গৌরব-গরিমা এমনকি লাজুকতাও। তবেই তুমি কিছু পাবে এবং অবশ্যই পাবে ইনশাআল্লাহ"

আলেমকুল শিরোমণি
শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.

তথ্য-উপাত্ত উদ্ধৃতির কারণে কলেবর একটু বড় হলেও রাহমানিয়া কর্তৃপক্ষের সমর্থক কিংবা সমালোচক সকলেরই এই বই পড়া উচিত। এতে কারো জানার ঘাটতি দূর হবে, কারো ভুল সংশোধন হবে, কেউ বদযুবানী ও বদগুমানী থেকে রক্ষা পাবেন। আর কেউ যদি মনে করেন কোন অংশে ভুল তথ্য পেশ করা হয়েছে তাহলে তিনি আমাদেরকে সঠিক তথ্য দিয়ে সংশোধন করার সওয়াব পাবেন।

কেননা, এটি হলো প্রাথমিক ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। আর মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। মোটকথা, বইটি রাহমানিয়া কর্তৃপক্ষের আত্মপক্ষ সমর্থন, নিরপেক্ষ আলেম সমাজের নিকট বিনীত আবেদন এবং প্রতিপক্ষের নিকট উদাত্ত আহ্বান।

رابطة أبناء الرحمانية
RABETA-E ABNA-E RAHMANIA
রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ-মাদরাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
rabetaar@gmail.com ০১৭৮০১৬৮৫৮২, ০১৯৩১৮৭৫৯৩৭